আপনাকে বলছি স্যার

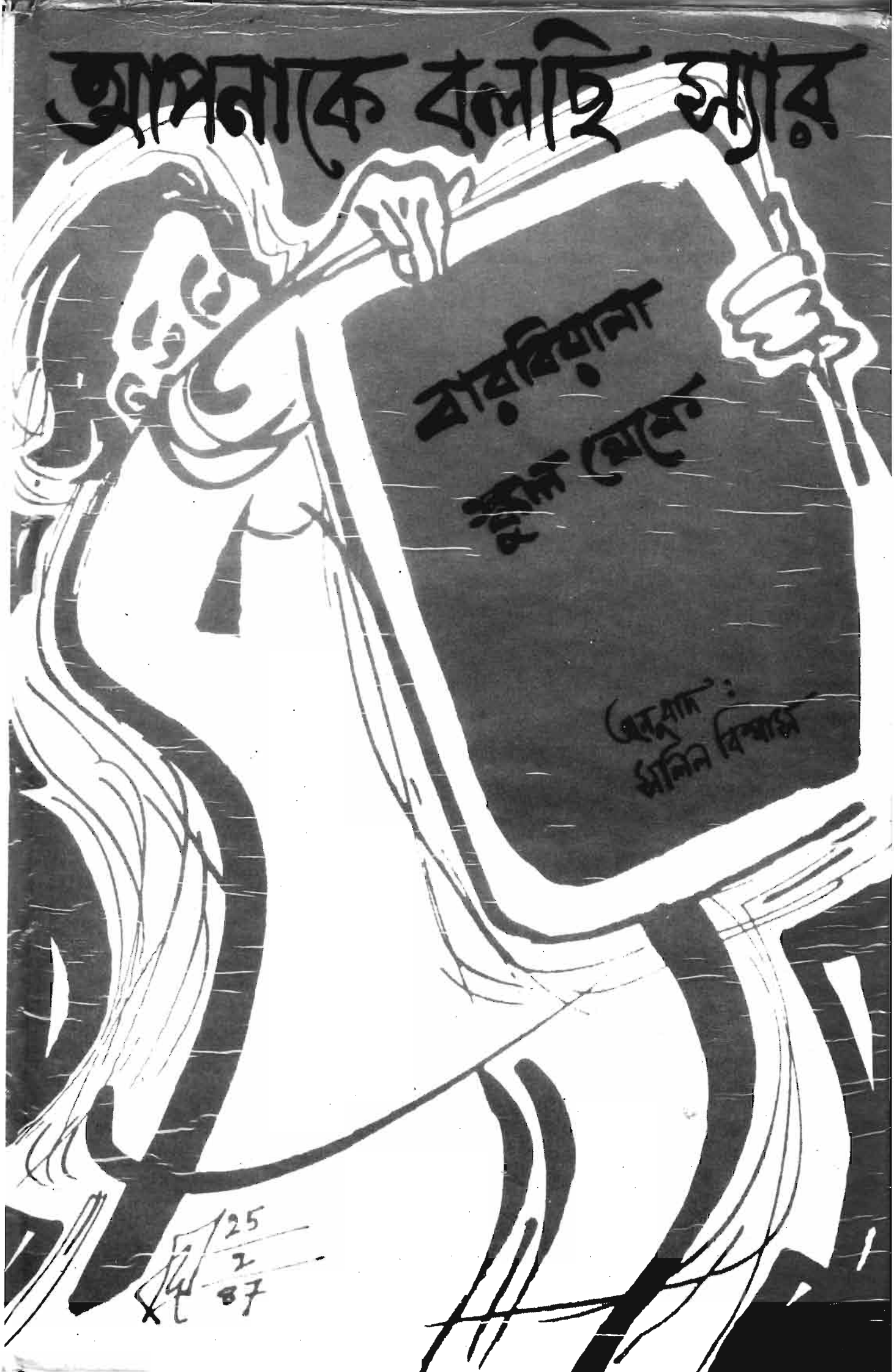

25
2
87

আপনাকে বলছি স্যার

বারবিয়ানা স্কুল থেকে

ভাষান্তর ঃ সলিল বিশ্বাস

বাউলমন প্রকাশন
৩৪ সেন্ট্রাল রোড (রামঠাকুর সরণি), যাদবপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩২

APNAKE BOLCHHI SIR — BARBIANA SCHOOL THEKE,
Translated in Bengali by Salil Biswas from LETTER TO
A TEACHER by SCHOOL OF BARBIANA.

© সমতা বিশ্বাস কর্তৃক বঙ্গানুবাদের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক ঃ শর্মিষ্ঠা রায়
বাউলমন প্রকাশন, ৩৪ সেন্ট্রাল রোড (রামঠাকুর সরণি), যাদবপুর, কলকাতা — ৩২
e-mail ঃ roy_sarmistha@vsnl.net
মুদ্রণ ঃ গিরি প্রিন্ট সার্ভিস, ৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা — ৯
প্রচ্ছদ ঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ডিস্‌প্লে প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৬/৩ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা — ১৯
প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা চৈত্র, ১৩৯৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১লা আষাঢ়, ১৪০৩
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ১লা মাঘ, ১৪০৯
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
ISBN ঃ 81-86552-07-3
মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

সূ চী প ত্র

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভূমিকা

প্রথম ভাগ

বাধ্যতামূলক স্কুলে ছাত্রদের ফেল করানো উচিত নয়

● প্রিয় স্যার ১ ● পাহাড়ি মানুষ ২ ● শহুরে ছেলেরা ৫ ● পরীক্ষা ১০ ● নতুন ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল ১৯ ● পরিসংখ্যান ২২ ● জন্মেই আলাদা ? ২৪ ● সবটাই ছিল আপনার হাতে ২৬ ● হুজুর মালিক ৩৫ ● বাছাই করার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ৩৯ ● কার জন্য পড়াচ্ছেন ৪১ ● আমরা যে সব সংস্কার চাই ৪৪ ● ফেল করাবেন না ৪৪ ● সর্বাত্মক শিক্ষণ ৪৭ ● সর্বাত্মক কাজ ও পরিবার ৪৯ ● চব্বিশ ঘণ্টা কাজ এবং ইউনিয়নের অধিকার ৫০ ● সর্বাত্মক স্কুল আর বিষয়বস্তু ৫৪ ● একটি লক্ষ ৫৬

দ্বিতীয় ভাগ

"ম্যাজিস্ট্রেলে"ও আপনি ফেল করান, কিন্তু…

● ইংল্যাণ্ড ৬৩ ● আত্মঘাতী নির্বাচন ৬৬ ● লক্ষ ৭০ ● যে সংস্কৃতি সকলের প্রয়োজন ৭৬ ● যে সংস্কৃতি আমাদের কাছে আপনি দাবি করেন ৭৮ ● ফৌজদারী বিচার ৮৮ ● সংক্রমণ ৯২ ● চিঠিপত্র ৯৪ ● রোগ নিরাময় ৯৭

প্রান্তকথা

নৈঃশব্দের সংস্কৃতি ভাঙার আওয়াজ ১০৩

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

একটি ছেলের কথা ব্যক্তিগতভাবে জানি, অনেক কষ্টে মাধ্যমিক পাশ করে আমি যে কলেজে পড়াই সেখানে ভর্তি হয়ে সে বসতে গিয়েছিল উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়। সেই বেড়া ডিঙোনো হয়নি অবশ্য তার — বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক এবং আরও তিনটে বিষয়ে যথারীতি ফেল করেছিল সে। আমি তাকে একটুও সাহায্য করতে পারিনি। শুনেছি এখন সে আর পড়াশোনা করার-চেষ্টাই করে না। তার পরিবর্তে ছেলেটি কী করে এখন সে খবর আমার জানা নেই। সত্যি ছেলেটির উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার 'যোগ্যতা' ছিল না। না পারত ইংরেজি লিখতে, না পারত বাংলা লিখতে, কঠিন অঙ্ক জানত না একেবারেই।

শিক্ষকতা শুরু করেছিলাম সেই আটষট্টি সালে। চৌত্রিশ বছর বড় কম সময় নয়। অনেক অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশেছি নানা ভাবে। তাদের কেউ শান্ত কেউ উদ্ধত, কেউ অনেক পড়ে কেউ কম, কেউ ভালো নম্বর পায় কেউ ফেল করে, কেউ আমাকে মনে রেখেছে কেউ রাখেনি। ভালো লাগত, যদি বলতে পারতাম, তাদের সকলকে মনে রেখেছি। কোনো কোনো মুখ স্পষ্ট ভাসে চোখের সামনে। কোনো কোনো মুখ আবছা। বেশিরভাগ মুখ আবার একেবারেই হারিয়ে গেছে।

মনে আছে সেই ছেলেটিকে, অসভ্য ছেলে বলে দুর্নাম ছিল যার, যে পর পর প্রায় এক মাস সব কাজ ফেলে আমাকে আগলে আগলে পৌঁছে দিত স্টেশনে, বাইরে থেকে আসা এক পরীক্ষার্থী আমাকে মারবে বলেছিল বলে। মনে আছে সেই ছেলে দুটিকে যারা কলেজে আমার এক শিক্ষাকর্মী বন্ধুকে মেরেছিল। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, 'লাশ ফেলে দেবো'। মনে আছে সেই মেয়েটিকে, খাতা দেখে দিয়েছিলাম বলে যে আমাকে এক মুঠো ফুল এনে দিয়েছিল। মনে আছে সেই ছেলেটিকে যে জানতে চেয়েছিল আলডুস হাক্সলির 'দ্য গেটস্ অব পারসেপশন' বইটা-আমি পড়েছি কি-না, আমরা মাস্টারমশাইরা যাকে ঠাট্টা করতাম গোপনে, যার কৌতূহলকে আমরা বলতাম পাকামো। মনে আছে সেই ছেলেটিকে, প্রাক্-স্নাতক স্তরে ইংরেজি পড়ার যার ভীষণ আগ্রহ ছিল, যে প্রাণপণ চেষ্টা করত ইংরেজি পড়ার আর লেখার, যে কোনোদিন ইংরেজি শিখতে পারবে না। যার কথা উঠলে এখনো স্টাফ রুমে হাসির রোল ওঠে।

মনে নেই সেই মাঝারি ছাত্রদের, যারা মাঝারি রেজাল্ট করে মাঝারি চাকরি পেয়ে মাঝারি জীবন কাটাচ্ছে। মনে নেই সেই খারাপ ছাত্রদের, যারা খারাপ রেজাল্ট করে সামান্য কোনো চাকরি করছে, অথবা চাকরি পায়ইনি। কী জীবন কাটাচ্ছে তারা তা আমরা জানিই না।

কাকে মনে থাকে আর কাকে মনে থাকে না সেটা নির্ভর করে ছাত্রটির দৃশ্যমানতার উপরে। যে অন্যদের তুলনায় পৃথক তাকেই আমরা মনে রাখি। যে পার্থক্যগুলো আমাদের চোখ টানে সেগুলোর হিসেব নিলেও একটা বিচিত্র ছক চোখে পড়বে। যে চেহারায় আলাদা সে আমাদের চোখ টানে। যে পোশাকে স্বতন্ত্র তাকে আমরা লক্ষ্য করি। যে খুব পড়ে তাকে আমরা তখনই দেখি যখন সে আমাদের কাছে আসে। খুব যে দুষ্টু তাকে দেখি শাসন করার সময়ে। আর খুব বেশি করে লক্ষ্য করি, মাথায় তুলি, প্রশংসায় প্রশংসায় আলোড়িত করি তাকে, যে খুব ভালো নম্বর পায়।

ছকটার সঙ্গে কিন্তু 'শেখা' ব্যাপারটার সম্পর্ক বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। যে শিখতে চাইছে তাকে আমরা মনে রাখছি হাসির খোরাক হিসেবে। মনে রাখার অন্য কারণগুলো সবই শিক্ষানিরপেক্ষ। পরীক্ষায় অনেক নম্বর পাওয়াকে আমি শিক্ষানিরপেক্ষ ব্যাপার বলেই ধরছি। যে সমস্ত ছাত্র অনেক নম্বর পায় তাদের কৃতিত্বের অবমূল্যায়ন না করেও এ কথা বলা যায়।

কিন্তু যারা উপরে বলা বর্গগুলো থেকে আলাদা তাদের আমরা ভুলে যাই। তাদের সঙ্গে কোনোরকম দেওয়া-নেওয়া আমাদের থাকে না। তাদের আমরা একটা মুখহীন দল হিসেবে ভাবতেই অভ্যস্ত। আমাদের কাছে এদের পরিচয় 'ক্লাস থ্রি' বা 'ইলেভেন ওয়ান', অথবা 'ফার্স্ট ইয়ার অনার্স', অথবা 'থার্ড ইয়ার টু'। কখনো বা আবার এরা 'রুম নাম্বার নাইনটিন' অথবা 'থার্টিফোর' অথবা 'ওয়ান'।

ওরা পরীক্ষা দেয়। কেউ পাশ করে, কেউ ফেল। শেখে না কিছু। কেন শেখে না তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। ভেবে দেখা দরকার, আমরা শিক্ষকরা দিনের পর দিন পরীক্ষায় পাশ করার বা বেশি নম্বর পাওয়ার কিছু 'কৌশল' ছাড়া আর কিছু ছাত্রদের শিখিয়েছি কি ? 'লেটার টু এ টিচার' এই ভাবনাটাই ভাবতে শুরু করিয়েছিল। সেই ভাবনার প্রক্রিয়া আজও চলছে। বারবিয়ানার ছেলেদের চিঠির উত্তর আজও লেখা হয়নি। হয়ত আগামীদিনে লিখতে পারব।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলাম, কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু গত কয়েক বছরে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সে পরিবর্তন সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দিচ্ছে। পাল্টে দিচ্ছে আমাদের মানসিকতাকে।

বারবিয়ানার ছাত্ররা কী চেয়েছিল ? তারা চেয়েছিল, পিছিয়ে থাকা ছেলেমেয়েরাও যেন পড়াশোনা শেখে, গরিব মানুষ যেন শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, পরীক্ষা যেন ভূত হয়ে তাদের ঘাড়ে চেপে বসে না থাকে, মাস্টারমশাইরা যেন একটু সহৃদয় হন, স্কুলগুলিতে শিক্ষক যেন সার্বিক শিক্ষাদানের কথা ভাবেন। তারা বলেছিল, স্কুল যদি কেবল 'ভালো' শিক্ষার্থীর কথাই ভাবে, তাহলে তো শিক্ষাদানের কোনো অর্থই থাকবে না, যে হাসপাতাল কেবল সুস্থ মানুষের জন্যে, তাকে তো হাসপাতাল বলাই যায় না। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেমেয়েরা তো এমনিতেই এগিয়ে থাকে, পড়াশোনার বাতাবরণ পেয়ে যায় তারা এইটুকু বয়েস থেকেই। যারা তা পায় না, সেই সব দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তানদের জন্যে স্কুল যেন বিশেষ করে ভাবে।

বারবিয়ানার ছাত্ররা খুব বেশিকিছু চায়নি, অযৌক্তিক কিছু চায়নি। তারা যা চেয়েছিল তা সব ছেলেমেয়ের মৌলিক অধিকারেরই জিনিস, খাতায়-কলমে সেসব তাদের আইনত প্রাপ্য।

তা, আইনের কথা যদি বলেন — এক্ষুণি বলবেন শিক্ষার হর্তাকর্তারা — আইন মোতাবেক সব শিশুর জন্যে তো বিনি পয়সার স্কুল আছেই, প্রাথমিক শিক্ষা একদম 'ফ্রি' করে দেওয়া হয়নি কি ? তাছাড়া, এইসব স্কুলে পরীক্ষার জুজুও নেই, টকাটক এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উঠে যাচ্ছে সকলে। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকও অবৈতনিক করা হয়েছিল, কিন্তু কী করা যাবে, পয়সাকড়ি নেই, সাশ্রয় করতে গেলে অপ্রয়োজনীয় খরচ তো কমাতেই হয়, তাই ..... তবে হ্যাঁ, পরীক্ষা এখানেও দিতে হয় না। একেবারে মাধ্যমিক, একেবারে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়।

কিন্তু ওই বিনে পয়সার স্কুলগুলির হাল কীরকম তা আমরা সবাই জানি। 'ভালো' স্কুলে পড়তে পয়সা লাগে। স্বভাবতই গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা সেখানে যেতে পারে না। যেতে পারে না তার আরও কারণ আছে। তার মধ্যে একটি হল, ভর্তি হতে হলে 'মেধা' নামক একটি বস্তুর পরীক্ষা দিতে হয়। অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্যও সেখানে ভর্তির একটি পূর্ব শর্ত। এই ব্যবস্থা কেবল এদেশেই যে আছে তা নয়, বেশিরভাগ দেশের অবৈতনিক বিদ্যায়তনগুলির অবস্থা একইরকম খারাপ।

স্পষ্ট বলা হচ্ছে এখন — লেখাপড়া শিখতে হলে পয়সা দিতে হবে, সে তুমি যেই হও। প্রাথমিক পর্যায়ে দিতে হবে না, মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিকে দিতে হবে, উচ্চশিক্ষায় তো দিতেই হবে। শুধু দিতেই হবে তাই নয়, অনেক দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা সকলের জন্যে নয়, সমাজের বিশেষ কিছু শ্রেণীর মানুষই তার যোগ্য। সেই যোগ্যতার মাপকাঠি তথাকথিত 'মেধা'ও নয় কিন্তু, মাপকাঠি পয়সা। এই বক্তব্যের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অনেকেই একমত।

এ কথা হয়ত মানা যায় যে স্কুল-কলেজ চালাতে যে পরিমাণ পয়সা লাগে তা জোগাড় করতে হলে ছাত্রদের দেয় পুরোনো মাইনের হার বহাল রাখা মুশকিল। সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আজকে সব রঙের সব সরকার গল্পের শিয়ালের মতো এক রা কাড়ছে — শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা আর ভর্তুকি দিতে পারব না। নিজেদের খরচ, হে স্কুল-কলেজবৃন্দ, তোমরা নিজেরা জোগাড় করে নাও। জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সরকারের দায় নয়। কোনো সরকার এ কথা খোলাখুলি বলছে, কোনো সরকার ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে। এই দ্বিতীয় বর্গের শাসকরা কায়দা করে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যাতে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কিছুদিনের মধ্যেই ভিক্ষাপাত্র হাতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হবে এবং সেই তাদের কথামতো শিক্ষার রূপরেখা বদল করতে হবে। স্বভাবতই সেখানে নিবন্ধের গোড়াতে উল্লিখিত ওই ছেলেটির কথা কেউ ভাববে না। এমনকি, 'যোগ্যতা' নামক বস্তুটিকে ভিত্তি করে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াও হয়ে যাবে তামাদি, শিক্ষালাভের অধিকার নির্ধারণের সময় একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে আর্থিক সক্ষমতা।

নির্লজ্জভাবেই বলে দেওয়া হচ্ছে — শিক্ষাও একটি পণ্য, যা পরিচালিত হবে তথাকথিত বাজারের নিয়ম অনুযায়ী। কী ধরনের শিক্ষা চালু থাকবে তা ঠিক করা হবে চাহিদা অনুসারে। সে শিক্ষা কিনবে সেই যার ক্রয়ক্ষমতা আছে। কিছুদিন আগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উপাচার্য দূরদর্শনের পর্দায় সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, শিক্ষা পণ্য তো বটেই। এই সূত্রে মনে পড়ছে, বিখ্যাত সাহিত্যিক জুল ভ্যের্ণ তাঁর একটি উপন্যাসে লিখেছিলেন, একবিংশ শতাব্দীতে সবচাইতে বড় এবং অর্থকরী ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে শিক্ষা। এখন যে কোনো সংবাদপত্রে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিক্ষাসংস্থার বিজ্ঞাপনগুলি ভ্যের্ণের ভবিষ্যৎবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বারে বারে।

এই সেদিন পর্যন্ত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সরকারের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কোনো দ্বিধা ছিল না। সেই দায় সরকার কতটা বহন করত সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট হলেও কিছু ধারণা প্রচলিত ছিল যার মধ্যে দেশ, সমাজ ও সাধারণ মানুষের স্থান ছিল প্রশ্নাতীত। ভুল করে হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং জ্ঞানার্জনকে সমার্থক বলে মনে করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষালাভ এবং জ্ঞানার্জনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে ফেলা হচ্ছে। শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানার্জন ঘটছে কি ঘটছে না সে বিবেচনা বর্তমানে একেবারেই গৌণ প্রতিপন্ন হয়েছে। খুব গোদা ভাষায় বললে বলা চলে,

শিক্ষালাভের প্রায় একমাত্র লক্ষ্য হল — মার্কিন মুলুক বা সমপর্যায়ের কোনো দেশের জন্যে সস্তায় পরিষেবা প্রদানের উপযুক্ত হয়ে ওঠা। তাতেই নাকি দেশের মঙ্গল। শিল্প-টিল্প তো বেচেই দেওয়া হয়েছে, উৎপাদন-প্রক্রিয়াও এখন বকলমে অন্যদেশি। বিদেশিদের তো আপ্যায়ন করে নিয়ে আসা হচ্ছে শিল্পায়নের, বিশ্বায়নের নামে। শিক্ষাকে পরিষেবাকেন্দ্রিক করে ফেলাই তো সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ।

এক ধরনের ব্যবসা চালু হয়েছে কিছুদিন হল। নাম 'বডি শপিং'। নিশ্চয় গালভরা একটা কোনো পোশাকী নামও আছে। বিদেশের কোনো ব্যবসায়ী সংস্থায় কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন পড়েছে। 'বডি শপিং' ব্যবসায়ীকে তা জানানো হলে সে এদেশ খুঁজেপেতে তেমন এক ব্যক্তিকে জোগাড় করে দেবে এবং বিনিময়ে কিছু অর্থ পাবে। আগে এই ব্যক্তিটি বিদেশে চলে যেত। কিন্তু আজকাল কম্পিউটারের যুগে বহু কাজ এখানে বসেই করে দেওয়া যায় ওসব দেশের জন্যে। সুবিধা হয়ে গেছে আরও বেশি। ক্রীতদাস প্রথার এই নতুন রূপ বেশ মনোগ্রাহী নয় কি?

এই চিন্তার সঙ্গে আমরাও ক্রমশ নিজেদের চিন্তা মিলিয়ে নিচ্ছি।

অন্য যে পরিবর্তন এসেছে শিক্ষাজগতে তার চেহারা একইরকম ভয়ানক। পাঠ্যসূচীকে ক্রমশ শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব মতবাদের প্রচারমাধ্যম করে ফেলা হচ্ছে। এতদিন এটা রেখেঢেকে করা হ'ত, এখন খোলাখুলি করা হচ্ছে।

'শিক্ষাব্যবস্থা' বলে চলতি যে কথাটা আছে সেটা একটা ভ্রান্ত ধারণার উচ্চারিত রূপ। বোধহয় 'বিদ্যালয়-ব্যবস্থা' কথাটা অধিকতর মানানসই। 'শিক্ষা'-র আদৌ কোনো ব্যবস্থা কোথাও আছে কি ?

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিদ্যালয়-ব্যবস্থা সমাজের সর্বাধিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইতিহাসের যে কোনো বিশেষ সময়ে সরকারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি এবং/অথবা দলের দার্শনিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক চিন্তা এবং কর্মপদ্ধতি সেখানে প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয়-ব্যবস্থার শুধু নয়, যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই তাই ঘটে। বিদ্যালয়-ব্যবস্থা যেহেতু সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম এবং মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে সর্বাধিক সক্ষম এবং যেহেতু এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা, নিরপেক্ষ চরিত্র ও পবিত্রতা সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা সবচাইতে বেশি, সেহেতু সব সময়েই চেষ্টা থাকে এই ব্যবস্থার উপর গভীরতম কর্তৃত্ব স্থাপন করার। অথচ, দীর্ঘ আয়ু এই ব্যবস্থাকে একটা নিজস্ব আকৃতি ও গতিবেগ দিয়েছে, এর সঙ্গে কতকগুলো মূল্যবোধকে জড়িত করে দিয়েছে, এর মধ্যে কতকগুলো ধারণাকে সম্পৃক্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও উপ-প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক ধরনের সম্মান দিয়ে তাদের কাছে কিছু পাওয়ার চাহিদা মানুষের মনে তৈরি করে দিয়েছে। ফলে এই ব্যক্তিরা ও উপ-প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু মূল্যবোধকে ধরে রাখতে এক রকম বাধ্য হয়। মানুষের মনে বিদ্যালয়-ব্যবস্থা এক পবিত্রতা-বোধ জাগিয়ে তোলে এবং তা অতিরিক্ত পরিবর্তনের চেষ্টা বা তার উপরে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা মানুষের মনে চরম বিরূপতার জন্ম দেয়। কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্যে তাই অনেক সময় ঘুরপথে যেতে হয়, যে পথ সততই বিপদসঙ্কুল এবং কুটিল। কিন্তু তাহলেও, শাসন ও কর্তৃত্বরক্ষার নিজস্ব যুক্তিস্রোত ব্যক্তির ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণের পথে চলতে বাধ্য করে।

কিন্তু শিক্ষা পণ্যে পরিণত হয়ে জাতে উঠলে এই ঝামেলা অনেকটা মেটে। তখন বাজারে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের নিয়মে চলার তাগিদে পণ্যের চেহারা বদলে দেওয়া সহজতর

হয়। পাঠ্যসূচীকে যেমন দরকার তেমন করে ঢেলে সাজানো চলে। সারা দেশ জুড়ে এই কাজে মেতেছে এখন শাসককুল।

শিক্ষাকে পণ্যে পর্যবসিত করার পথ সুগম করতে হলে এবং নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর করতে হলে আর একটি কাজ করা দরকার। তা হল, শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও উপ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজপ্রদত্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত করা। সেই লক্ষ্যে চলার পথে শিক্ষকদের অকর্মণ্য প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে শাসকগোষ্ঠী। সমাজের অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও বিকৃতিমুক্ত নয়, শিক্ষকরাও সকলে সৎ এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু দেশের মানুষ লেখাপড়া শিখছে না তার একমাত্র কারণ কেবল এখানেই খুঁজতে হবে, এ কথা বলার পেছনে কাজ করে অন্যত্র নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি একশো ভাগ দক্ষ, শিক্ষকরা একশো ভাগ সৎ হলেও ব্যাপারটা একই থাকত।

অথচ স্ববিরোধ শাসকবর্গের অমোঘ ব্যাধি। তাদের দক্ষতাও এদেশে অনেক ছোটমাপের। সব চোটপাট তাই চলছে শিক্ষকদের উপরে। তাদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না, নিয়োগের প্রথাই বদলে দেবার চেষ্টা চলছে, মাইনে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পণ্য যা উৎপাদন হচ্ছে তা বেশ নীচু মানের। অবশ্য এইভাবে হয়ত একটা আগাছা নিড়ানোর প্রক্রিয়াও চালু হয়ে গেছে। যে শিক্ষাসংস্থা করে খেতে পারবে সে টিকে যাবে, যে পারবে না সে বিলুপ্ত হবে।

বারবিয়ানার ছেলেরা শিক্ষকদের কাজের সময় নিয়ে কটাক্ষ করেছিল। সেই প্রসঙ্গে একটি পাদটীকায় হিসেব দেওয়া হয়েছিল কলেজ শিক্ষকদের দৈনন্দিন কাজের সময়ের। এখন খাতায়-কলমে যা নিয়ম চালু হয়েছে তার সুবাদে আমাদের সেই হিসেব এখন আর সঠিক নেই। এখন কলেজে শিক্ষকদের কাজ থাক বা না থাক একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকতেই হয়। এই নিয়মটা অবশ্যই নীতিগতভাবে ভালো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নিয়মকে খুব বুদ্ধিদীপ্ত বলা যায় না। কাজ নেই, শুধু নিয়ম মানতে বসে থাকো, এতে কতটা সময় নষ্ট হয় সেটা কেউ ভাবছে না। আর কাজ নেই এ কথা কে বলেছে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এত ছাত্র আসছে যাচ্ছে, সেখানে শিক্ষককে কাজ দেওয়া যাচ্ছে না, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আসলে, সেই কাজগুলি করার জন্যে যে পরিকাঠামো দরকার সেটা নেই। সেই পরিকাঠামো দেবার জন্যে যে অর্থব্যয় করতে হবে, তাও নেই। ঘুরেফিরে আমরা কিন্তু আবার সেই একই জায়গায় পৌঁছে গেলাম। অর্থসংস্থান করতে হবে। কী করে করা যাবে? ছাত্রের দেয় মাইনে প্রচুর বাড়িয়ে দাও। কিন্তু তাতেও পর্যাপ্ত অর্থ আসবে না। তখন সেই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়, কোনো না কোনো দাতা জুটেই যাবে। দুধেল গাই-এর চাট অবশ্য একটু সহ্য করতে হবে।

আরও একটা মর্মান্তিক আঘাত আসছে শিক্ষার উপরে। ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষাকে সীমিত করার কাজে নেমেছে হিন্দুত্ববাদী বর্বরের দল। গুজরাটের সমস্ত স্কুল-কলেজে মুসলমান সমাজের ছেলেমেয়েদের ভর্তি হওয়ার অধিকারকে প্রকারান্তরে লুপ্ত করতে চলেছে তারা। শিক্ষার সুযোগ এমনিতেই সকলের জন্যে নেই। এই নতুন প্রচেষ্টা বৈষম্যের ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। গুজরাটের উদাহরণকে ব্যতিক্রম মনে করার কিন্তু কোনো কারণ নেই, নিজেদের দিকে একবার ভালো করে তাকালে হয়ত আমরাও এমন কোনো বীজ খুঁজে পাব যা বিষবৃক্ষের জন্ম দিতে চলেছে।

অবশ্য, যে পাদটীকার কথা বললাম, সেটা যে সর্বাংশে খারিজ হয়ে গেছে তাও নয়। যে শিক্ষকরা আগে ফাঁকি দিতেন, তাঁদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে, নিয়ম মানতে হবে বলে সবচাইতে বেশি সোচ্চার ব্যক্তিবর্গ সবচাইতে কম সময় থাকেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তাঁদের অন্যত্র অন্য কাজ থাকে।

প্রথম যেদিন বাউলমন প্রকাশনের তরফ থেকে আমাকে জানানো হল, 'আপনাকে বলছি স্যার'-এর তৃতীয় সংস্করণ বেরোবে, সেদিনই সন্ধ্যেবেলা কফি হাউসে আমার একজন ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বই-এর নতুন সংস্করণ হলে সব লেখকের বা অনুবাদকেরই আনন্দ হয়। আমিও বেশ খুশি হয়ে সেই বন্ধুকে বলেছিলাম নতুন সংস্করণের কথা। কিন্তু তার মন্তব্য আমার উৎসাহের মাথায় একেবারে বরফজল ঢেলে দিয়েছিল। মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য — 'আপনাকে বলছি স্যার' ? সে বই কেউ এখনো পড়ে নাকি ?

আসলে আমার বন্ধুটি জানতে চেয়েছিল, আজকের পরিস্থিতিতে বইটির কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা।

মনে হয়, প্রাসঙ্গিকতা বেড়েছে ছাড়া কমেনি। সুদূর ইতালির এক ক্ষুদ্র জনপদে বসে বারবিয়ানার ছেলেরা স্কুল স্তরে শিক্ষার ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করে চিঠি লিখেছিল শিক্ষকদের কাছে, উচ্চশিক্ষার স্তরে কী কী হতে পারে তা নিয়ে বিশেষ কোনো কথা তারা বলেনি। তবুও, তাদের চিঠিতে এমন কিছু গভীরতর বক্তব্য লীন হয়ে আছে যা জ্ঞানার্জনের সকল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক সংবেদনশীল মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। আজ এত বছর পরেও 'আপনাকে বলছি স্যার' পড়ে যে কোনো পাঠকের মনই তাই উদ্বেল হয়। বারবিয়ানার ছেলেদের লেখা চিঠির প্রাপক বস্তুত সর্বকালের সমস্ত শিক্ষক।

বারবিয়ানার ছেলেরা জ্ঞানার্জনের কথা বলেছিল, বলেছিল শিক্ষা সকলের জন্যে সমান হওয়া উচিত। শিক্ষকদের শায়েস্তা করার কথা বলেনি, শিক্ষকদের বলেছিল সহমর্মী হতে। গরীব ঘরের দুর্বল ছাত্রদের কথা ভেবে শিক্ষার মান নীচু করার কথা বলেনি, বলেছিল তাদের জন্যে সমমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা। পরীক্ষা অবলোপের কথা বলেনি তারা, বলেছিল পরীক্ষাকে মানবিক করে তোলার কথা। তারা চেয়েছিল পরীক্ষা যেন অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের অন্যতম পদ্ধতি হয়ে ওঠে। তারা বলেছিল, একটা পর্যায়ের পরে পরীক্ষার মান আরও উন্নততর করার কথা। শিক্ষকদের যেন কঠোরতম পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হয়, এ কথাও বলেছিল তারা।

তাদের প্রতিটি কথায় নিহিত ছিল শিক্ষার পণ্যায়নের সার্বিক বিরোধিতাই।

তাই আজকের দিনে 'আপনাকে বলছি স্যার' বইটির বক্তব্য আরও বেশি করে অনুধাবনের প্রয়োজন বেড়েছে অবশ্যই।

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য সেই সব পাঠকের যাঁরা এই বই আজও কিনছেন। সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ পাবেন **'বাউলমন প্রকাশন'** সংস্থার কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীবৃন্দ। আশা করব, বইটি এবার আরও এক নতুন প্রজন্মের হাতে যাবে। বারবিয়ানার ছেলেদের কথা শুনবে তারা, ভাববে সেই ছেলেটির কথা — যে উচ্চশিক্ষার দ্বারপ্রান্তে এসেও ব্যর্থ মনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে প্রান্তিকতায় ব্রাত্য তার প্রাক্তন জীবনে।

সলিল বিশ্বাস

জানুয়ারী, ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"আপনাকে বলছি স্যার" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, অনেকেই বইটি পড়ে খুব প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, বইটা পড়ে সবাই বাহবা দিলেও, বারবিয়ানা-র ছেলেদের কথা খুব কম মানুষই শুনলেন। গরীব মানুষকে পড়াবার কাজে এগিয়ে আসতে দেখেছি খুব সামান্য ক'জনকে। প্রথম সংস্করণের প্রান্তকথা-র কিছুই সংযোজন করতে হল না।

কিছু কি বদলেছে গত ক'বছরে? যদি আমাদের অগোচরে বদলে থাকে কোথাও, কেউ যদি "আপনাকে বলছি স্যার" পড়ে গরিব মানুষের পড়াশোনার জন্য কিছু করে থাকেন, তাহলে খুবই ভাল লাগবে। তাঁদের সাথে যোগাযোগ হলে ভাল লাগবে আরও বেশি।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের (!) প্রাতিষ্ঠানিক — সরকারী বা বেসরকারী — সংগঠনগুলির কথা অবশ্যই বলছি না। তেমন সংগঠনের অভাব নেই। নিরক্ষরতা কতটা কাটছে সেটাই প্রশ্ন···।

চোখের সামনে অজস্র নিরক্ষর মানুষের চেহারা ভাসে। চোখের বাইরে এমন মানুষ আছেন অগুন্তি। অথচ চারদিকে পরিসংখ্যানের ডমরু বেজে চলেছে — দিকে দিকে এখন নাকি সাক্ষরতা ছড়িয়ে পড়ছে, অনেক জায়গায় নাকি একশ' ভাগ মানুষ সাক্ষর হয়েই গেছেন! এই ঢক্কানিনাদ শুনে বারবিয়ানা-র ছেলেরা কী বলত তা শুনতে ইচ্ছে যায়। তাছাড়া, বারবিয়ানা-র ছেলেরা শুধু সাক্ষরতার কথা বলেনি, তারা বলেছে সার্বিক শিক্ষার কথা। সাক্ষরতা আর শিক্ষায় যে তফাৎ আছে, তা অনেকেই ভুলে যান।

এমনই যদি পরিস্থিতি তাহলে আর একবার "আপনাকে বলছি স্যার" প্রকাশ করা কেন?

গত বছরগুলিতে আরও অনেক পাঠক তৈরি হয়েছেন যাঁরা বইটি পড়েননি। আমাদের আশা, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বা বারবিয়ানা-র ছেলেদের ডাকে সাড়া দেবেন। আর, হয়তো বা কেউ, অতীতে বইটি পড়েছেন, এখন আরও একবার পড়ে মনে করবেন—যাই না, দেখি না ওই অচলায়তনটাকে আবার একটা ধাক্কা দেওয়া যায় কিনা!

দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু তথ্য ইচ্ছা সত্ত্বেও বদলানো গেল না। ইটালির শিক্ষাব্যবস্থায় গত ক'বছরে নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু চেষ্টা করেও আমরা সে সব নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। পরিসংখ্যানও নিশ্চয় নবীকরণের দাবি রাখে। তবে যতদূর মনে হয় — অন্তত এ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার হালচাল দেখে — মৌলিক প্রবণতায় পরিবর্তন বড় একটা আসেনি।

Danger School নামে একটি পুস্তিকায় ছবি আছে—বিশাল একটা পাথর, সেটাকে হাতুড়ি, গাঁইতি, কোদাল নিয়ে ভাঙতে চেষ্টা করছে বেশ কিছু মানুষ, একটু একটু করে চিড় ধরছে কঠিন পাথরে। অচলায়তনটা যে ভাঙবে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই, হাতুড়িটা তাই হাতে ধরে রাখতেই হবে! "আপনাকে বলছি স্যার" হয়তো সেই কাজে সাহায্য করবে আবার প্রকাশলাভ করে। হয়তো আবার দাগ পড়বে কারো মনে।

সলিল বিশ্বাস

জুন, ১৯৯৬

ভূমিকা

ইটালির টাসকানি প্রদেশের মুয়েলো অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় গোটা কুড়ি খামার নিয়ে গঠিত একটি জনবসতি — বারবিয়ানা। ফ্লোরেন্স শহর থেকে মাইল তিরিশেক দূরে বিখ্যাত শিল্পী জিওত্তো-র জন্মস্থান ভিচ্চিও থেকে আঁকাবাঁকা একটি মেঠো রাস্তা ধরে এগোলে পৌঁছানো যায় বারবিয়ানাতে।

জায়গাটা রুক্ষ অথচ সুন্দর। প্রস্তরময় পাহাড়ের ঢাল, বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কিছু চষা জমি আর কয়েকটি ফলের বাগান।

ছোট্ট একটি গির্জা আছে এখানে। ১৯৫৪ সালে পাদ্রি ডন লরেঞ্জো মিলানি আসেন গির্জাটির ভারপ্রাপ্ত হয়ে। শ্রমিকদের জন্য একটি সান্ধ্য স্কুল চালাবার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। বারবিয়ানাতে এসে লরেঞ্জো মিলানি দেখলেন, এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জগৎ বলতে প্রায় কিছুই নেই। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই হয় পরীক্ষায় ফেল করে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, অথবা যেভাবে স্কুলে শিক্ষাদান করা হয় সে বিষয়ে তাদের তিক্ততার শেষ নেই। সে তিক্ততা তাদের নিরুৎসাহ করেছে এবং আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। মিলানি জড়ো করলেন দশটি ছেলেকে। এগারো থেকে তেরো বছর তাদের বয়স। সপ্তাহে ছ' সাত দিন, দিনে আট ঘণ্টা পড়া আর লেখার ব্যবস্থা করা হল তাদের। কিছুদিনের মধ্যে আরও দশটি ছেলে এসে জুটল। বয়সে যারা বড়, তারা ছোটদের পড়াবার জন্য সময় দিতে লাগল অনেকটা। তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যাবলি নিয়ে অনুশীলন আর সে সব সমস্যার ভিতরে ঢোকার চেষ্টায় কাটত অনেকটা সময়। এই কাজের মধ্য দিয়ে, এক বছর সময় ধরে, বিশেষ একটা পরিকল্পনার রূপায়ণ হিসাবে, এই স্কুলের আটজন ছাত্র "আপনাকে বলছি স্যার" (Letter to a Teacher) বইটি লিখেছিল।

১৯৬৭ সালে ডন লরেঞ্জো মিলানির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বারবিয়ানা স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্কুলটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি। কিছু কিছু কৃষক বারবিয়ানা ছেড়ে শহরে চলে গেছেন কাজের খোঁজে। তবু তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র হারায়নি। তারা সকলেই কাজকর্ম করে — কেউ ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কর্মী, কেউ বা কলে-কারখানায় মিস্ত্রি। প্রায়ই রবিবার রবিবার তারা তাদের পুরানো ক্লাসঘরে এসে মেলে নানা জিনিস আলোচনা করতে।

১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে বারবিয়ানাতে যাঁরা গেছেন তাঁরা দেখেছেন — ফ্লোরেন্সের এক অনাথ আশ্রমের কিছু ছেলেমেয়ে জমায়েত হয়েছে এক ক্যাম্পে। কিছু "পুরানো" ছাত্র, বয়স তাদের ষোল-সতেরো, কমবয়সীদের পড়াচ্ছে। নড়বড়ে টেবিল ঘিরে, মাচাগুলোর নিচে, রান্নাঘরে, নানা বয়সের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় ব্যস্ত। সে বছর হেমন্তে বারবিয়ানা স্কুল উঠে আসে ফ্লোরেন্সের কাছে ক্যালেন্‌জানো শহরে। বারবিয়ানা স্কুলের কিছু প্রাক্তন ছাত্র, ডন মিলানির কিছু পুরানো বন্ধু আর অন্য কয়েকজন ছাত্র একজোট হয়ে এখানে ছোট এবং প্রাপ্তবয়স্ক—দু'ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্যই একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছেন — যেখানে স্কুলের পরে পাঠ্যবস্তুগুলো নিয়ে নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা হয়েছে। এ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র একটা বড় ঘর, কিছু চক, কিছু বই আর বেশ কিছু শিক্ষাব্রতী মানুষ নিয়ে — যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় এখানে পঠন-পাঠনে সাহায্য করেন। এখানকার বাতাবরণ পরিপূর্ণ বারবিয়ানা স্কুলের আদর্শে আর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায়।

ইটালীয় স্কুলব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। ছ'বছর বয়সে স্কুলে যেতে শুরু করে শিশু। প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ বছর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা তিন বছর — সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। চোদ্দ বছর বয়সের পরে যদি কেউ শিক্ষাগ্রহণ চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে তার সামনে বিভিন্ন পথ — "লিসিও ক্লাসিকো"-তে পাঁচ বছর ল্যাটিন, গ্রিক, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা, পাঁচ বছর "লিসিও সায়েন্টিফিকো"-তে কিছু ল্যাটিন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জোর দিয়ে পড়াশোনা করা, "ইনস্টিটিউটো টেকনিকো"-তে প্রযুক্তিবিদ্যা শেখা, "লিসিও আর্টিস্টিকো"-তে কারুশিল্প অধ্যয়ন করা, চার বছর "ম্যাজিস্ট্রেল"-এ প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়ে "ম্যাজিস্টেরো"-তে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকতা করবার যোগ্যতা অর্জন করা, অথবা চার বছর "টেকনিশ্"-এ বৃত্তিগত শিক্ষালাভ করা।

স্কুল শেষ হয় দুপুর দেড়টা নাগাদ। তারপরের সময়টা নষ্ট হয় যদি না ছাত্রের বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ থাকে। অবস্থাপন্ন বাবা-মা গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারেন কিন্তু দরিদ্র পরিবারের শিশুরা কোনো সাহায্যই পায় না। ফলে পড়াশোনায় তারা অনেক পিছিয়ে পড়ে।

পরীক্ষা হয় প্রথম পাঁচ বছর পরে একবার, মাধ্যমিকের তিন বছর পরে দ্বিতীয়বার, আর উচ্চমাধ্যমিকের শেষে। অত্যন্ত কড়া পরীক্ষা ব্যবস্থা। শতকরা ষাট ভাগ নম্বর পেলে তবে পাশ। স্বভাবতই দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা ফেল করে সবচেয়ে বেশি।

* * * *

দরিদ্র, গ্রাম্য স্কুলের ছেলেদের লেখা এই বই "আপনাকে বলছি স্যার" পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রায় সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিত্ততোষণ আর মধ্যবিত্ত মানসিকতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপর এই বই-এর সরাসরি আক্রমণই দেশে দেশে এই বই-এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

এ বই-এর "আমি" আটজন তরুণ লেখকের সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব আর "আপনি" হলেন তাদের পরিচিত সকল শিক্ষকবৃন্দ।

আমরা, যারা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সরাসরি জড়িত, যারা এই ব্যবস্থা থেকে শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ার অত্যাচারে জর্জরিত, যারা তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি আর সার্বজনীন শিক্ষার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করছি, যারা মনে করি এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, যারা মনে করি এই ব্যবস্থা কেবল কতিপয়ের স্বার্থরক্ষার খাতিরে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে অস্বীকার করছে, যারা মনে করি সমগ্র শিক্ষক সমাজের নিজেদের দিকে একবার সাদা চোখে তাকানোর সময় অতিক্রান্তপ্রায়, তাদের প্রত্যেকের উচিত বারবিয়ানা স্কুলের এই আটটি ছেলে কী বলছে, তা কান পেতে শোনা।

"লেটার টু এ টীচার" বইটির এই অনুবাদ একক প্রচেষ্টা নয়।

"ফোরাম ফর এডুকেশন"-এর সাথে যুক্ত প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর যে যৌথ প্রচেষ্টার ফলে কলকাতার কোনো কোনো অঞ্চলে ছোট ছোট শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে তথাকথিত ফেল করা, স্কুল-খেদানো অবহেলিত ছেলেমেয়েদের জন্য, সেই প্রয়াসেরই অন্যতম ফসল এই বাংলা তর্জমা।

প্রথমে ধন্যবাদ জানানো দরকার বারবিয়ানা স্কুলকে। বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়ে তাঁরা আমাদের বাধিত করেছেন।

অনুবাদ করার সময় আমরা মূল বই-এর কিছু অংশ বাদ দিয়েছি, পরিসংখ্যানগুলো ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। বিতর্ক এড়াতে বাদ দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে দু'একটি কথা। সর্বদা নজর রাখা হয়েছে যাতে মূল বই-এর স্বাদ নষ্ট না হয়।

ভাষাগত নানা পরিবর্তনের উপদেশ দিয়ে ও প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছেন সবিতা বিশ্বাস। সাহায্য করেছেন সুব্রত মজুমদার। অনুবাদের প্রতিটি পর্যায়ে এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন জয়ন্তী বসু ও অনীশ বসু।

মার্চ, ১৯৮৭ — সলিল বিশ্বাস

● প্রথম ভাগ ●

বাধ্যতামূলক স্কুলে ছাত্রদের ফেল করানো উচিত নয়

প্রিয় স্যার

আমাকে আপনার মনে পড়বে না। আমার নামও নিশ্চয় আপনি ভুলে গেছেন। আপনি আমাকে আর আমার মতো অনেককে অনেকবার ফেল করিয়েছেন।

আমি কিন্তু আপনার কথা অনেক ভেবেছি, আপনার মতো শিক্ষকদের নিয়ে চিন্তা করেছি। যে অচলায়তনটিকে আপনারা "স্কুল" বলেন তার আসল চেহারা দেখেছি। সেইসব ছেলেমেয়েদের কথা আমার মাথায় ঘুরে বেড়িয়েছে যাদের আপনারা ফেল করিয়ে কলে-কারখানায় আর মাঠে ছড়িয়ে দেন, আর, বেমালুম ভুলে যান তাদের কথা।

● **সংকোচ** দু'বছর আগে, যখন "ম্যাজিস্ট্রেল"[১]-এর প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলাম, আপনি আমাকে সংকুচিত করে রাখতেন সব সময়। দেখুন, এই হীনমন্যতা সেই ছেলেবেলা থেকে আমার নিত্যসঙ্গী। ছোট বয়সে তো মাটি থেকে চোখই তুলতাম না। দেওয়াল ঘেঁসে চলতাম সন্তর্পণে, কারো সামনে যেন পড়তে না হয়।

প্রথমে ভেবেছিলাম, এ বোধহয় আমার একার বা আমার পরিবারের রোগ। আমার মা একটা মনিঅর্ডারের ফর্ম দেখলেও কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। বাবা সব দেখেন, সব শোনেন, কথা বলেন না।

পরে মনে হল, এ বোধহয় পাহাড়ি লোকেদেরই রোগ। সমতলের কৃষকরা আর শহরের শ্রমিকরা নিশ্চয়ই নিজেদের উপর আস্থা রাখেন। কিন্তু কোথায়?

১: "ম্যাজিস্ট্রেল" হল প্রাথমিক স্কুল-শিক্ষক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র। চার বছর এই প্রশিক্ষণ চলে।

শ্রমিকরা দেখছি একই রকম কাঁচুমাচু হয়ে থাকে। যার খুঁটির জোর আছে, সে যখন ভাল কাজটা আর দায়িত্বশীল পদগুলো হাতিয়ে নেয়, তখন, শ্রমিকরা তো কই কিছু বলে না! লোকসভায় আর সরকারের সব পদে তো ঐ লোকগুলোই ভিড় করে আছে।

শ্রমিকরাও তাহলে আমাদেরই মতো। আসলে এ হল গরিব মানুষের মনের অসুখ। কেন এমন হয়? আমি গরিব ঘরেরই ছেলে। তাও, বলতে পারব না, কেন এমন হয়। এটা হয়তো কাপুরুষতা নয় অথবা সাহসিকতাও নয়। এ বোধহয় কেবল ঔদ্ধত্যের অভাব।

পাহাড়ি মানুষ

● **সকলের জন্য স্কুল** যে পাঁচ বছর প্রাথমিক স্কুলে পড়েছি, সরকার আমাকে দিয়েছে নিম্ন স্তরের ফালতু শিক্ষা। একটা ঘরের মধ্যে পাঁচটা ক্লাস একই সাথে চলছে।[২] তার মানে আমি পেয়েছি আমার প্রাপ্য শিক্ষার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমেরিকাতেও কালো চামড়ার মানুষ আর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিভেদ স্থায়ী করে রাখতে এইরকম ব্যবস্থা আছে। নিচু তলার গরিব মানুষের জন্য প্রথম থেকেই নিচু স্তরের গরিব স্কুল।

● **শিক্ষা নাকি বাধ্যতামূলক** পাঁচ বছর প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর আমার অধিকার আছে তিন বছর আরও শিক্ষালাভের। আমাদের সংবিধান তো বলে আমি নাকি এই শিক্ষা নিতে আইনত বাধ্য। কিন্তু ভিচ্চিওতে মাধ্যমিক স্কুল নেই। আছে বোরগো শহরে। সেখানে পড়তে যাওয়া ভীষণ খরচের ব্যাপার। কেউ কেউ বহু কষ্টে গেছে সেখানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়েছে।

আমার শিক্ষক তো আমার বাবা-মাকে বলেই দিলেন, মিথ্যে পয়সা খরচা করছেন এর পেছনে। মাঠে পাঠান ওকে, চাষ করে খাক। লেখাপড়া ওর জন্য নয়।

বাবা উত্তর দেননি। মনে মনে ভেবেছিলেন, আমরা যদি বারবিয়ানায়

---

২ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : এই কলকাতায় কোনো কোনো পৌর-সভা পরিচালিত স্কুলে এই অবস্থা বর্তমান।

সংযোজন : এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার আজ দশ বছর পরেও অবস্থা কিছুই পাল্টায়নি।

থাকতাম তাহলে ওকে লেখাপড়ার জন্য তৈরি করে নেওয়া হ'ত।

● **বারবিয়ানা** বারবিয়ানাতে সব ছেলেরাই স্কুলে যায়। ধর্মযাজকের স্কুলে। ভোর থেকে সন্ধ্যে, শীতে, গ্রীষ্মে সব সময়ে। ওখানে "লেখাপড়া" সকলের জন্য।

কিন্তু আমরা ভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অনেক দূরে থাকি। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় বাবা খবর পেলেন সান মারটিনো থেকে একটি ছেলে বারবিয়ানাতে পড়তে যায়। সাহস করে কথা বলতে গেলেন বাবা।

ফিরলেন আমার জন্য একটা টর্চ, একটা টিফিন কৌটো আর বরফে হাঁটার বুট হাতে। স্কুলে যাব আমি।

প্রথম দিন বাবার সাথেই গেলাম, পাক্কা দু'ঘণ্টা লাগল। চলতে চলতে রাস্তা সাফ করতে হল নিড়ানি দিয়ে। পরে অবশ্য একঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যেতাম।

● **একলা নির্জন পথে** পথে মাত্র দু'টো বাড়ি চোখে পড়ত, এমন নির্জন রাস্তা। সে দু'টো আবার পোড়ো বাড়ি। কখনো কখনো ছুটে যেতে হ'ত। রাস্তায় হয়তো দেখতাম একটা বিষাক্ত সাপ অথবা মাঝে মাঝে পাহাড়ের গুহায় যে পাগলটা থাকত সে চিল্লাত আমাকে দেখে।

আমার বয়স তখন এগারো। আপনি হলে ভয়ে মরেই যেতেন। দেখছেন তো, আমাদের দু'জনের ভীরুতা কেমন দু'রকমের! কী রকম শোধবোধ হয়ে যাচ্ছে বলুন তো!

অবশ্য সমান হওয়াও হল না। আপনিও যদি আমার মতো স্কুল থেকে ছাঁটাই হয়ে বাড়িতে বসে থাকতেন অথবা আমাদের মতো করে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হতেন তাহলে বলা যেত আমরা সমান।

● **অন্যরকম স্কুল** বারবিয়ানাতে এসে অবাক হলাম। এ কেমন স্কুল? শিক্ষক নেই, ডেস্ক নেই, ব্ল্যাকবোর্ড নেই, বেঞ্চ নেই। কতগুলো বড় বড় টেবিল কেবল। তার উপরেই পড়া। তার উপরেই খাওয়া। প্রত্যেকটা বই-এর একটা করে কপি। ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে সকলে মিলে পড়ছে সেগুলো। বোঝাই যায় না, সেই ছেলের দলেই একজন যে একটু বয়সে বড়, পড়াচ্ছে সেই।

এই মাস্টারদের মধ্যে সবচেয়ে যে বয়সে বড় সে ষোল বছরের। আর সবচেয়ে ছোটজন বারো বছরের। আমার একেবারে তাক লেগে গেল। তখুনি ঠিক করলাম, আমিও শিক্ষক হব।

● **সেরা ছাত্র** ভাববেন না ওখানে খুব আরামে ছিলাম। ভীষণ শৃঙ্খলা, কেবল তর্কবিতর্ক। মনে হ'ত, দূর ছাই, আর আসব না পড়তে। কিন্তু মজাটা কোথায় জানেন? যদি কোনো ছাত্রের বাড়িতে পড়াশুনার পরিবেশ নেই দেখা যেত, যদি কাউকে মনে হ'ত একটু পিছিয়ে পড়া বা অলস, তাহলে তাকে সবাই যত্ন করতে শুরু করত। আপনারা যেমন সেরা ছাত্রদের তোয়াজ করেন, অনেকটা তেমন। মনে হ'ত স্কুলটা যেন তার একার। যতক্ষণ সে একটা পড়া না বুঝত, ততক্ষণ অন্যরা এগোত না অন্য পাঠে। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকত।

● **ছুটি** ছুটি বলতে আমাদের কিছু ছিল না। এমনকি রবিবারও নয়। আমাদের কারো কোনো আপত্তি ছিল না তাতে। কাজ করতে হলে কষ্ট হ'ত অনেক বেশি। কিন্তু কোনো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এলে এ নিয়ে শুরু হ'ত কচ কচি। একবার এলেন এক বিখ্যাত অধ্যাপক, "আপনি, ফাদার মিলানি, শিক্ষাতত্ত্ব পড়েননি। আপনি জানেন না যে, পোলিয়ানস্কি লিখেছেন, খেলা-ধুলো ছেলেদের জন্য একটা ফিজিওসাইকো……।"[৩] আমাদের দিকে না তাকিয়েই উনি কথাগুলো বলছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমশাই, স্কুল-ছাত্রদের দিকে তাকাবেন কেন? আমরা কি তাকাই আমাদের মুখস্থ করা নামতাগুলোর দিকে?

তা উনি চলে যাবার পর লুসিয়ো বলে উঠল, "বাড়িতে বসে গোয়াল ঘরে ছত্রিশটা গরু-মোষের গোবর সাফ করার চেয়ে স্কুলে সারাদিন খাটনি অনেক ভাল।"

● **চাষীর মনের কথা** জানেন স্যার, এই যে কথাটা লুসিয়ো বলল, এটা আপনাদের সব স্কুলের দরজার উপর খোদাই করে রাখা উচিত। লক্ষ লক্ষ চাষীর ছেলের মনের কথা এটা। আপনি বলবেন ছেলেরা স্কুলে পড়ার চাইতে খেলা বেশি পছন্দ করে। কোনো চাষীর ছেলেকে, কোনো খেটেখাওয়া মানুষের ছেলেকে, জিগ্যেস করে দেখেছেন কখনো, সে কী বলে? করেননি। অথচ দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ কিন্তু এরাই। এদের দশজনের মধ্যে ছ'জনই লুসিয়োর সাথে একমত হবে।

৩ঃ পোলিয়ানস্কি কে জানি না। নিশ্চয় কোনো দিগ্‌গজ ব্যক্তি। আর ওই যে "ফিজিও…" কী যেন, নিশ্চয় খুব ভারি কোনো জ্ঞানের কথা। কথাটার শেষটা মনে রাখতে পারিনি। আমরা তো শিক্ষাতত্ত্ব পড়িনি।

আপনাদের সংস্কৃতির ব্যাপারটাই এই, আপনারা মনে করেন আপনারাই গোটা দুনিয়া।

● **ছাত্ররাই শিক্ষক** যাই হোক, আবার স্কুলের কথায় আসি। পরের বছর আমি হলাম শিক্ষক ওখানে। সপ্তাহে তিন দিন, এক বেলা করে। পড়াতাম ভূগোল, অঙ্ক আর ফরাসি ভাষা। মাধ্যমিকের প্রথম শ্রেণীতে।

ম্যাপ দেখতে তো আর ডিগ্রি লাগে না অথবা ভগ্নাংশ শেখাতে তো আর অঙ্কে মহাপণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই!

ভুল করতাম না কি আর! কিন্তু তাতে ক্ষতি হ'ত না। বরং ভালই হ'ত। ছেলেরা একটু স্বস্তি পেত। সকলে মিলে লাগা হ'ত তখন সেই ভুল শোধরাতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, নিশ্চিন্তে, বিনা গণ্ডগোলে। নির্ভয়ে। আমার মতো করে ক্লাস সামলাতে আপনি কোনোদিন পারবেন না স্যার।

● **স্বার্থ** সাথে সাথে আমিও শিখছিলাম অনেক কিছু। যেমন, শিখলাম অন্যদের সমস্যাগুলোও আমার সমস্যার মতোই। একসাথে সমস্যার সমাধান করতে পারলে সহমর্মিতা বাড়ে। একা একা সমস্যা সমাধান করা এক ধরনের স্বার্থপরতা।

আমি অবশ্য স্বার্থপরতা থেকে একদম মুক্ত ছিলাম এমন নয়। পরীক্ষার সময় আমার মনে হ'ত, দিই বাচ্চাগুলোকে ভাগিয়ে, নিজের পড়া নিয়েই থাকি। আমার মানসিকতা ছিল আপনার স্কুলের ছেলেদের মতোই। কিন্তু বারবিয়ানাতে এ কথা তো আর বলা চলত না! ইচ্ছে না থাকলেও উদার হতে হ'ত আমাকে।

আপনার কাছে হয়তো মনে হচ্ছে, এ তো সামান্য ব্যাপার। কিন্তু আপনার ছাত্রদের জন্য আপনি তো এটুকুও করেন না। তাদের শুধু বলেন, পড়াশুনা করে যাও একা একা, নিজের মতো, নিজের জন্য।

শহুরে ছেলেরা

● **বিকৃতি** কিছুদিন পরে ভিচ্চিওতে যখন মাধ্যমিক স্কুল চালু হল, শহর থেকে কিছু কিছু ছেলে বারবিয়ানাতে আসতে শুরু করল। সবাই নয়, শুধু যারা ফেল করল ওখানে।

তাদের মধ্যে লজ্জা বা সংকোচ ছিল না। কিন্তু অন্য ধরনের অদ্ভুত

সব বিকৃতি ছিল তাদের। যেমন, তারা ভাবত, খেলাধুলো, ছুটি, এসব তাদের অধিকার, আর স্কুল করা মানেই শাস্তি। ওরা জানতই না স্কুলে যায় লোকে শিখতে, আর স্কুলে যেতে পারাটা একটা বিশেষ সৌভাগ্য। তাদের কাছে শিক্ষক হল শত্রুপক্ষ। তাকে ঠকানোই হচ্ছে কাজ। তারা, এমনকি, পরীক্ষায় টোকাটুকিরও চেষ্টা করত। আমাদের এখানে যে পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া হয় না, পাশ ফেল ব্যাপারটাই নেই, এ কথা বুঝতে তাদের সময় লাগল অনেক।

● **কোন্‌টা আকর্ষণ** এদের আরেকটা অদ্ভুত ব্যবহার দেখা যেত যৌন-তার ব্যাপারে। এ বিষয়ে এরা কথা বলত ফিস্‌ফাস্‌ করে। মোরগ ও মুরগি বা অন্য কোনো জীবজন্তুর সঙ্গম দেখলে এরা এমন ভাব করত যেন ভীষণ অশ্লীল কিছু দেখছে সামনে। অথচ যৌন সব কিছুতেই তাদের অসীম আগ্রহ দেখা যেত প্রথম প্রথম। আমাদের স্কুলের শারীরবিদ্যার বইটা নিয়ে এক কোণে গিয়ে গুজগুজ ফুস্‌ফুসের অন্ত ছিল না তাদের। বইটার দু'টো পাতা তো প্রায় ছিঁড়ে যাবার দাখিল হল। ক'দিন পরেই অবশ্য ওরা আবিষ্কার করল বইটাতে কৌতূহলোদ্দীপক আরও অনেক কিছু আছে। আরও পরে তারা বুঝল, ইতিহাস বিষয়টিও খুবই চিত্তাকর্ষক হতে পারে। তাদের মধ্যে অনেকেই এখনও একটার পর একটা নতুন নতুন আগ্রহের বস্তু আবিষ্কার করে চলেছে। সব বিষয়ই এখন ভাল লাগে তাদের। ছোট ছেলেদের তারা এখন পড়ায়। আমাদের সাথে মিশে গেছে তারা।

কেউ কেউ অবশ্য মিলতে পারল না কোনোমতেই। আপনারা তাদের মনগুলিকে এমন জমাট পাথুরে করে দিয়েছেন যে, তারা আর কোনোদিনই মন খুলে কিছু করতে পারবে না।

● **মেয়েরা** শহর থেকে কোনো মেয়ে কোনোদিন বারবিয়ানা আসেনি। আসেনি হয়তো আসার পথটা খুব বিপজ্জনক বলে। হয়তো বা তাদের বাবা-মার মানসিক মালিন্যের জন্য। ওঁরা অনেকেই মনে করেন মেয়েমানুষের আবার লেখাপড়া শেখার দরকার কী? পুরুষেরা মেয়েদের মধ্যে বুদ্ধিটুদ্ধি চায় না। এও এক ধরনের জাতি বিদ্বেষ। এই একটা ব্যাপারে অবশ্য আপনাকে প্রশংসা করব। মেয়ে ছাত্রদের আপনি ছোট করে দেখেন না।

● **সান্‌দ্রো আর জিয়ানী** এবারে আসুন, আপনাকে দু'টি ছেলের কাহিনী শোনাই।

সান্দ্রোর বয়স পনেরো। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। অপমানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সে বড় হয়েছে। তার শিক্ষকরা বলে দিয়েছেন, সে একটা নির্বোধ। তাঁরা তাকে তিন বছর ধরে রেখে দিয়েছেন মাধ্যমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে।

জিয়ানীর বয়স চোদ্দ। অমনোযোগী, লেখাপড়ার প্রতি ভীষণ ঘৃণা। তার শিক্ষকরা তাকে বলে দিয়েছেন যে—সে বয়ে গেছে। কথাটা হয়তো পুরো মিথ্যে নয়, কিন্তু তাই বলে তাকে ঝেঁটিয়ে স্কুল থেকে বিদায় করতে হবে?

দু'জনের কারোরই ইচ্ছে ছিল না আবার পড়াশুনা করার। দু'জনেই লেখাপড়া ছেড়ে চাকরির চেষ্টা করার কথা ভাবছিল। আমাদের কাছে এসেছিল এই কথা শুনে যে, আমরা কে কত নম্বর পেয়েছি তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। যার যা বয়স সেই অনুযায়ী ঠিক করি সে কোন্ ক্লাসে পড়বে।

সান্দ্রোকে আমরা ভর্তি করলাম মাধ্যমিকের তৃতীয় শ্রেণীতে আর জিয়ানীকে রাখা হল দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তাদের অসুখী ছাত্রজীবনে এই প্রথম তারা তৃপ্তিকর কিছু পেল। সান্দ্রো এ কথা মনে রাখবে চিরজীবন। জিয়ানী হয়তো কখনো কখনো মনে করবে এ কথা। আরেকটা পরিতৃপ্তির বিষয় হল তাদের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন।

আপনি ওদের এক অহেতুক উৎকর্ষের পিছনে ছুটিয়েছিলেন। একই কথা বারে বারে শুনতে শুনতে, শেখার চেষ্টা করতে করতে ওরা ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। ওদিকে বয়স বাড়ছিল ওদের। তার পাঠ্যবস্তু বদলাচ্ছে না, কিন্তু সে তো নিজে পাল্টাচ্ছে। ফলে বিষয়গুলি ক'দিন পরেই তার কাছে নেহাতই ছেলেমানুষি হয়ে পড়ছিল।

জিয়ানী ব্যাকরণ বিশেষ জানত না ঠিকই, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক জগৎ সম্পর্কে সে জানত অনেক কিছু। চাকরি-বাকরি, পারিবারিক সম্পর্ক, তার শহরের লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী, সবই সে জানত। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যাবেলা বাবার সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সভা বা শহরের কাউন্সিলের সভাতেও সে যোগ দিত।

আপনি প্রাচীন রোমান আর গ্রিকদের কার্যকলাপের বিবরণ শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে ইতিহাস সম্পর্কে বীতস্পৃহ করে ফেলেছিলেন। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনত আমাদের কাছে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

আপনি চেয়েছিলেন ও আরও এক বছর ধরে সেই ইটালির ভূগোল-বৃত্তান্ত

পড়ুক। স্কুল ছেড়ে তাকে হয়তো চলে যেতে হ'ত বাকি পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু না জেনে। আপনি ওর কত বড় ক্ষতি করছিলেন আপনি জানেন না। খবরের কাগজটাও ওর বোধগম্য হ'ত না কোনোদিন।

● **তুই তো কথাই বলতে পারিস্ না।** সান্দ্রো খুব অল্পদিনের মধ্যেই সব বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল। রাত-দিন খেটে, অজানা বিষয়ে নোট নিয়ে নিয়ে পড়ে, পুরানো পাঠ্যপুস্তক ঘেঁটে, সান্দ্রো পরের বছর আপনাদের স্কুলেই পরীক্ষা দিল, আর এই "নির্বোধ"টিকে আপনারা পাশ করাতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু জিয়ানী? আপনাদের স্কুল থেকে সে এসেছিল অশিক্ষিত অবস্থায়, বই সম্পর্কে অসীম ঘৃণা নিয়ে। তবুও কোনো কোনো বিষয়ে তাকে আগ্রহী করতে পেরেছিলাম আমরা। আপনাদের কাছ থেকে শুধু চেয়েছিলাম, আপনারা ওকে মাধ্যমিকের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করুন, আর একটু প্রশংসা করুন ওকে। বাকিটা আমরা দেখতাম।

কী করলেন আপনারা? মৌখিক পরীক্ষার দিন এক শিক্ষক ওকে ধমকে বললেন, "তুই প্রাইভেট স্কুলে পড়তে যাস, ছোকরা? তুই তো ভাল করে কথাই বলতে পারিস না।"...[৪]

আমরা তো জানি, জানি ভাল করেই, জিয়ানী ঠিকমতো কথা বলতে পারে না।

আমাদের সকলের এ জন্য বুক চাপড়ে বিলাপ করা উচিত। সবচেয়ে বেশি অনুতপ্ত হওয়া উচিত আপনাদের, যাঁরা ওকে আগের বছর স্কুল থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

● **কোন্ ভাষাটা শুদ্ধ** তাছাড়া, আমাদের তো ঠিক করে বুঝে নেওয়া দরকার এখুনি, শুদ্ধ ভাষা কী বস্তু। ভাষা তো সৃষ্টি করে গরিব মেহনতী মানুষ, তারপর চিরদিন সেই ভাষাকে তারা নতুন নতুন সংযোজনে সমৃদ্ধ করে। আর বড়লোকেরা কতগুলি নিয়মে সে ভাষাকে বাঁধে, যাতে অন্যভাবে কথা বললেই "ভুল ভুল" বলে তাচ্ছিল্যভরে চিৎকার করা যায়। অথবা, পরীক্ষায় ফেল করানো যায় ভাষাজ্ঞানের অভাবের অজুহাতে।

আপনি বলবেন, "দ্যাখো তো, ছোট্ট পিয়েরিনো কী সুন্দর লিখতে

৪: যে কথাটা এ কথার উত্তরে আমাদের মুখে আসছে সেটা কোনো প্রকাশক ছাপতে রাজি হবেন না।

পারে।" পারেই তো! সে তো আপনাদের ভাষা জানে। সে তো আদরের দুলাল। আপনাদের কোম্পানির অংশবিশেষ।

অন্যদিকে, জিয়ানী যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষা লেখে, সে ভাষা তার বাবা ব্যবহার করেন। যখন জিয়ানী ছোট্ট ছিল তখন সে "রেডিও"-কে বলত "রারা"। তার বাবা শুধরে দিয়ে বলতেন, "বলো, 'আরাডিও'।"[৫] জিয়ানী তাই শিখেছে। যদি সম্ভব হয়, নিশ্চয় জিয়ানীকে শুদ্ধ কথা "রেডিও" বলতে শিখতে হবে। শেখাই উচিত। আপনাদের ভাষাতেও এরকম "অশুদ্ধ, কিন্তু প্রচলিত" কথা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এইটুকু ভুলের জন্য জিয়ানীকে স্কুল-ছাড়া করার কোনো যুক্তি নেই।

আমাদের সংবিধান বলে, সব নাগরিক সমান, সে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন। ভেবেচিন্তে না হলেও, এ কথা বলার সময় সংবিধান-রচয়িতারা কিন্তু জিয়ানীর কথা মনে রেখেছিলেন। আপনারা অবশ্য ব্যাকরণকে সংবিধানের অনেক উপরে স্থান দেন।

জিয়ানী আমাদের কাছে আর ফিরে আসেনি। আর সে পড়াশুনা করবে না।

● **কলের পুতুল** আমরা কিছুতেই ওকে ভুলতে পারছি না, জানেন। দূর থেকে ওর খবর রাখি। শুনেছি, ও আর গির্জায় যায় না। কোনো রাজনৈতিক সভায় যায় না। শুনেছি, দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো সারা সপ্তাহ ও কোনো এক কারখানা ঝাঁট দেয়, শনিবার হয়তো একটা সিনেমা দেখে, রবিবার খেলার মাঠে গিয়ে অর্থহীন গলাবাজিতে সময় কাটায়। আপনারা, ওর শিক্ষকরা, ওকে বেমালুম ভুলে গেছেন।

● **হাসপাতাল** এইভাবেই প্রথম আমরা আপনার সংস্পর্শে আসি। আপনাদের সাথে আমাদের যোগসূত্র হল সেইসব ছেলেরা, যাদের আপনারা খেদিয়ে দিয়েছেন।

একথা ঠিক যে আমরাও দেখলাম এইসব ছেলেদের নিয়ে স্কুল চালানো কত কঠিন। এদের বাদ দিয়ে কেবল ভাল ছেলেদের জন্য স্কুল চালানোর প্রলোভন যে আমাদের মনে উঁকি দেয়নি এমন নয়। কিন্তু এদের বাদ দিলে

---

৫ : ইংরেজি অনুবাদকের মন্তব্য : ইটালির আঞ্চলিক ভাষায় "রেডিও"-কে "আরাডিও" বলে। অভিধানের ভাষায় এ ধরনের শব্দকে বলে "অশুদ্ধ, কিন্তু প্রচলিত"।

স্কুল তো আর স্কুল থাকবে না। কোনো হাসপাতাল যদি কেবল সুস্থ ব্যক্তিদের পরিচর্যা করে আর রোগাক্রান্তদের বাদ দেয় তাহলে তাকে কী বলা হবে? তাহলে তো উপস্থিত বৈষম্যগুলোকে আরও জোরদার করবার একটা কলে পরিণত হবে আমাদের স্কুল।

আপনারা কি তাই চান? তা যদি না চান, তাহলে এদের স্কুলে ফিরিয়ে নিন. জোর দিয়ে পড়ান এদের, গোড়া থেকে শুরু করুন। লোকে পাগল বলবে? বলুক।

পাগলামো কি জাতি বিদ্বেষের চেয়ে অনেক গুণ ভাল নয়?

প রী ক্ষা

● **ভাল লেখার নিয়ম** তিন বছর বারবিয়ানাতে পড়ার পর জুন মাসে আমি গেলাম প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে। একটা রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল আমাকে। বিষয়টা কী বলুন তো? "একটি ট্রেনের কামরার জবানবন্দী।"

বারবিয়ানাতে ভাল রচনা লেখার নিয়মগুলো আমি শিখেছিলাম। যা বলবে তা যেন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়। সকলের, অন্তত অনেকের কাছে তার যেন একটা ব্যবহারিক মূল্য থাকে। কার জন্য লিখছ সেটা মনে রাখবে। প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করে তবে লিখতে বসবে। তোমার বিষয়বস্তু সাজিয়ে-গুছিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য করে তবেই লিখবে। অপ্রয়োজনীয় প্রত্যেকটা শব্দ বাদ দেবে। কথ্য ভাষায় ব্যবহার হয় না এমন কোনো শব্দ লিখবে না। এতটা সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করতেই হবে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম রাখা চলবে না।

এই যে আপনাকে চিঠিটা লিখছি, তা ঐ উপরের নিয়মগুলো মেনেই লিখছি আমি আর আমার সহপাঠীরা। আশা করি, আমি যখন শিক্ষক হব, তখন আমার ছাত্রদেরও এমনি করে লিখতে শেখাতে পারব।

● **আপনার হাতের অস্ত্র** "একটি ট্রেনের কামরার জবানবন্দী" রচনাটি লেখার সময় সব যুগে স্বীকৃত এইসব সামান্য কিন্তু সঠিক নিয়মগুলোকে মানা যায় কী করে? সত্যি সত্যি যা করা উচিত তা করতে গেলে সাদা খাতা জমা দিয়ে আসতে হয় পরীক্ষকের হাতে। অথবা বিষয় নির্বাচনকে সমালোচনা করতে হয় এবং যার মাথা থেকে এটা বেরিয়েছে তাকে একপ্রস্থ গাল দিতে হয়।

কিন্তু আমি চোদ্দ বছর বয়সী একটি পাহাড়ি ছেলে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হতে হলে ডিপ্লোমাটা আমার দরকার। খাতাটা পরীক্ষা করবে এমন পাঁচ-ছ'জন লোক যাদের আমার জীবনের সাথে কোনো যোগ নেই, আমি যা কিছু ভালবাসি, যা কিছু জানি তা থেকে যারা অনেক দূরে থাকে। যাদের কিছু আসে যায় না আমার পাশ করায় বা ফেল করায়।

চেষ্টা করলাম লিখতে। সুবিধা করতে পারলাম না, বুঝতেই পারছেন। আপনাদের ছেলেদের যদি এই রচনা লিখতে দিতেন তারা খুব চমৎকার লিখত সন্দেহ নেই। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাজে কথা ফেনিয়ে তোলার কাজে তারা তো ইতিমধ্যেই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

● **ফাঁদ** পরীক্ষা ব্যাপারটাই, জানেন, তুলে দেওয়া উচিত। আর যদি পরীক্ষা নিতেই হয় তাহলে অন্তত সুবিচার যাতে হয় সেটা দেখা উচিত। খামোখা কঠিন প্রশ্ন করে ছাত্র ঠকানোর প্রবণতা যেন না থাকে পরীক্ষকের। ছাত্ররা তো আর শত্রুপক্ষ নয়!

তবু আপনারা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে অবান্তর সমস্যা সাজিয়ে ছাত্রদের বিপদে ফেলেন। কেন করেন এমন? ছাত্রদের "ভাল"-র জন্য?

● **কোনো কাজে আসে না** আদৌ নয়। একজন ছাত্রকে ফরাসি ভাষায় ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর দিয়েছিলেন আপনি। অথচ ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসি ভাষায় অতি সাধারণ কোনো কথা বলারও তার সাধ্য হবে না। সে কেবল কতগুলো অপরিচিত আর কঠিন ফরাসি শব্দ জানে। শ'দুয়েক কঠিন ফরাসি শব্দ, যে সব শব্দ দৈনন্দিন জীবনে কোনো কাজে আসে না, তাকে শিখিয়ে ভাবলেন তাকে খুব ফরাসি শেখালাম।

কী হল লাভ? অনেকে যেমন অংককে ঘেন্না করে তেমনি সেই ছেলেটি ফরাসি ভাষাকে ঘেন্না করতে শিখেছে কেবল।

● **কেন শিখি ভাষা** আমি ভাষা শিখেছি গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে। প্রথম শিখেছি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আর সবচেয়ে সাধারণ শব্দগুলো। যেমন করে ছোটবেলায় নিজের মাতৃভাষা শিখি আমরা।

গত গ্রীষ্মে আমি গ্রেনোবল্[৬] শহরে একটা হোটেলে থালা-গেলাস ধোওয়ার কাজ করতাম। একবারও মনে হয়নি আমি অচেনা কোনো দেশে আছি।

---

৬ : ফ্রান্সের একটি শহরের নাম গ্রেনোবল্।

ইউথ হস্টেলে ইউরোপের অন্য দেশের আর আফ্রিকার ছেলেদের সংস্পর্শে এসেছিলাম।

বাড়ি ফিরে ঠিক করলাম একটার পর একটা ভাষা শিখে নেব। কেবল একটা ভাষা খুব ভাল করে শেখার চাইতে অনেকগুলো ভাষা কাজ চালাবার মতো শেখা ভাল। তাহলে নানা ধরনের লোকের সাথে মনের ভাব আদান প্রদান করা যাবে, নতুন নতুন মানুষ আর নতুন নতুন সমস্যার সামনাসামনি হওয়া যাবে। আর বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার ঐ কৃত্রিম সীমারেখাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

● **কী ভাবে শিখি** তিন বছর ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে পড়ার সময় আমরা একটা ভাষা[৭] না নিয়ে দু'টো বিদেশী ভাষা নিয়েছিলাম—ফরাসি আর ইংরেজি। যে পরিমাণ শব্দ শিখেছিলাম তাতে যে কোনোরকম তর্ক চালিয়ে যেতে পারতাম আমরা স্বচ্ছন্দে। ব্যাকরণের ভুল হলে তা নিয়ে বসে থাকতাম না আমরা। ব্যাকরণ লাগে প্রধানত লেখার সময়। পড়া আর কথা বলার সময় ব্যাকরণ ছাড়াও কাজ চালানো যায়। একটু একটু করে শুনে শুনেও ব্যাকরণ রপ্ত হতে থাকে। পরে ও নিয়ে বিশেষ পড়াশুনা করলেই চলে।

আমরা মাতৃভাষা তো এই করেই শিখি। আট বছর বয়সের আগে ব্যাকরণ কেউ পড়ে? তিন বছর পড়া আর লেখার পরে তবে আসে ব্যাকরণের নিয়ম শেখা।

আপনাদের স্কুলে নতুন পাঠক্রমে রেকর্ড ব্যবহার করার কথা বলা আছে। কিন্তু লাভ কিছু হয় না তাতে। যে সব স্কুলে ছাত্ররা চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পারে, সেখানে অন্য লেখাপড়ার পরে প্রত্যেক দিন দু'ঘণ্টা করে মন খুলে বসে যদি রেকর্ড শোনা যায়, তবেই কোনো উপকার হতে পারে। আপনারা যা করেন, সপ্তাহে তিন ঘণ্টা মোটে, তাতে কিছু কাজ হয় না।

● **ফালতু ব্যাপার** মৌখিক পরীক্ষার সময় আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, আপনার ছাত্রদের ফরাসি সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান একেবারে সাগরসমান। যেমন ধরুন, লয়ের (Loire) নদীর পাড়ে যে সব দুর্গ আছে সে সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান।

---

৭ : ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে তিন বছরে একটা—হয় ফরাসি নয় ইংরেজি—বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। কখনো কখনো রেকর্ড দেওয়া হয় ছেলেদের। —অনুবাদক।

পরে বুঝলাম ব্যাপারটা কী। সারা বছর ধরে এছাড়া তারা আর কিছুই পড়েনি। পাঠ্যসূচীর একটা অংশ বেছে নিয়ে তারা সেটা পড়তে আর অনুবাদ করতে শিখেছে কেবল।

ধরুন যদি একজন পরিদর্শক আসতেন, তাহলে তারা তাঁকে বেশ খুশি করতে পারত আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সুবিধে হচ্ছে পরিদর্শক তো পাঠ্যসূচীর বাইরে যেতেন না। যদিও, আপনি এবং আপনার পরিদর্শক জানেন এই ধরনের ফরাসি শেখার কোনো দাম নেই। আর এই শেখাটা কার জন্য? আপনি ছাত্রদের শেখাচ্ছেন, যাতে তারা পরিদর্শককে খুশি করতে পারে। পরিদর্শক খুশি করতে চাইবেন স্কুল অধিকর্তাকে। আর স্কুল অধিকর্তা খুশি করতে চাইবেন শিক্ষামন্ত্রীকে।

এই হল মজা। শেখাটেখা কোনো ব্যাপার নয়। স্কুলটাই হল আসল কথা। প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

ধান্দাবাজি কিন্তু আপনার ছাত্ররা কেন পড়ছে এটাই একটা রহস্য। কোনো উদ্দেশ্য আছে কি আদৌ? না কি যেটা আছে সেটা কেবল হাবিজাবি একটা ব্যাপার।

দিনের পর দিন তারা পড়ে যাচ্ছে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য, ভাল রিপোর্টের জন্য, আর ডিপ্লোমা পাবার অপেক্ষায়। অথচ যে সব ভাল ভাল জিনিস শেখার সুযোগ তাদের আছে সে সম্পর্কে তারা আগ্রহ হারাচ্ছে। ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস—এ সব কেবল পাশ করার মতো নম্বর পাবার কলে পরিণত হচ্ছে।

এইসব কাগজের টুকরোগুলোর আড়ালে লুকিয়ে আছে শুধু ব্যক্তিগত লোভের আশা। ডিপ্লোমা মানে হল টাকা। মুখে কেউ তা বলে না অবশ্য। কিন্তু হাঁড়ি ফাটালে ব্যাপারটা তাই দাঁড়াবে।

আপনাদের স্কুলে ভাল ছাত্র হতে হলে বারো বছর বয়স থেকেই সামাজিক প্রতিপত্তির ধান্দাবাজিতে তুখোড় হতে হবে।

কিন্তু বারো বছরের একটা ছেলে ধান্দাবাজিতে তুখোড় হতে পারে না। ফলে আপনার বেশির ভাগ ছাত্রই স্কুলকে ঘেন্না করতে শেখে। আপনারা যা তাদের করতে বলেন সব সময়, তাতে ঘেন্না হওয়াই স্বাভাবিক।

ইংরেজি আমাদের পাশের ক্লাসরুমে হচ্ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। সেটা একইরকম অদ্ভুত।

আমি মনে করি পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যে ইংরেজি হচ্ছে সবচেয়ে কাজের। কিন্তু ভাষাটা না জানা থাকলে তো কোনো কাজই হবে না! যারা কেবল উপর উপর জানে তারা কী করে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করবে? কঠিন শব্দ? ঐ ছাত্ররা দেখলাম "শুভরাত্রি" পর্যন্ত বলতে পারে না ইংরেজিতে। ফলে ভাষা শেখা সম্পর্কে তাদের অনীহা বাড়তেই থাকছে।

একজন অল্পবয়সী ছাত্রের কাছে প্রথম বিদেশী ভাষা শেখাটা একটা বিরাট ব্যাপার। ঠিকমতো যদি সেটা না শেখানো হয়, তাহলে ঝামেলা বাধবেই।

আমরা বাস্তবে দেখেছি ইটালিবাসীদের ক্ষেত্রে ফরাসি ভাষা শেখা সবচেয়ে কম কষ্টের। যতবার কোনো ফরাসি ভাষাভাষী অতিথি আমাদের ওখানে আসতেন, ততবারই দেখতাম কোনো না কোনো ছাত্র তাঁর কথা বুঝতে পেরে বিদেশী ভাষা বুঝতে পারার আনন্দ উপভোগ করতে পারছে। সেদিনই দেখতাম রাত্রে তারা তৃতীয় কোনো বিদেশী ভাষার রেকর্ড নিয়ে শুনতে শুরু করছে।

তখন তাদের হাতে এসেছে ভাষা শিক্ষার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র—অনুপ্রেরণা, বাধা পেরোতে পারার ক্ষমতায় আত্মবিশ্বাস, ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মানসিক ব্যস্ততা।

● **অঙ্ক এবং নির্যাতন** জ্যামিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও মারাত্মক। প্রশ্ন শুরু হচ্ছেঃ "একটি ঘনবস্তু রূপায়িত হইল একটি অর্ধগোলককে ক্ষেপিত করিয়া একটি বেলনের উপর, যাহার তল ত্রিসপ্তাংশ হইবে…"

কেবল তল (Surface) মাপার কোনো যন্ত্র নেই। বাস্তব জীবনে কখনোই মাত্রাগুলো (Dimensions) বাদ দিয়ে তলকে বোঝা যায় না। এই রকম একটা প্রশ্ন কেবল কোনো বিকৃত মস্তিষ্ক থেকেই বেরোতে পারে।

● **নতুন লেবেল** আরও মজা আছে। নতুন স্কুলগুলোকে নাকি সংস্কার করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা থেকে আহৃত প্রশ্নই শুধু নাকি সেখানে রাখা হয়। কাজেই, কার্লা যখন পরীক্ষা দিতে গেল তাকে প্রশ্ন করা হল একটা বয়লার-এর আকৃতি সম্পর্কে। শুরু করা হলঃ "একটি বয়লারের আকৃতি হইবে একটি অর্ধগোলককে ক্ষেপিত করিয়া… ।" যে কে সেই।

এর চেয়ে প্রাচীনপন্থী মাস্টারমশাই-ই দেখছি ভাল ছিলেন। "আধুনিক" হওয়ার ভান অন্তত তিনি করতেন না।

● **নির্বোধ** তা প্রাচীনপন্থী যে ভদ্রলোক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তিনি

দেখলেন, তাঁর নিজের ছাত্ররা কিছুতেই প্রশ্নটা সমাধান করতে পারছে না। আমাদের চারজন ছাত্রের দু'জন কিন্তু কোনোরকমে উত্তরটা বার করে ফেলল। ফল কী দাঁড়াল? আঠাশ জনের মধ্যে ছাব্বিশ জনই করল ফেল। আর শিক্ষকমশাই? তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, তাঁর ক্লাসের সব ক'টা ছাত্র নির্বোধ।

● **অভিভাবকদের ইউনিয়ন** এই ভদ্রলোককে কে সামলাতে পারে? স্কুলের অধ্যক্ষ মশাই পারেন, শিক্ষক পরিষদ পারে। কিন্তু তাঁরা কিচ্ছু করবেন না।

ছাত্রদের বাবা-মায়েরা হয়তো পারত। কিন্তু শিক্ষককে সমালোচনা করতে গেলে তাদের ছেলেমেয়েদের বিপদ হবে। ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরীক্ষায় পাশ-ফেল তো শিক্ষকের হাতে। ফলে অভিভাবকদের চুপ করেই থাকতে হয়। কী করা যেতে পারে? হয় শিক্ষকদের হাত থেকে পাশ-ফেলের অস্ত্রটা কেড়ে নিতে হবে অথবা অভিভাবকদের সংগঠিত করতে হবে।

বাবা-মায়েদের নিয়ে যদি একটা ইউনিয়ন গড়ে তোলা যেত, যে ইউনিয়ন আপনাদের স্পষ্ট বলত—আমরা আপনাদের মাইনে দিই, মাইনে দিই আমাদের সেবা করার জন্য, আমাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য নয়।

আপনাদের পক্ষে সেটা ভালই হ'ত। সমালোচনা না শুনলে মানুষের শুধু বয়সই বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে না। সমালোচনা মানুষকে জীবনের সাথে, ঘটনাপ্রবাহের সাথে যোগাযোগ রাখতে শেখায়। না হলে, মানুষ আপনাদের মতো নির্জীব জীবে পরিণত হয়।

● **সংবাদপত্র** গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমি সবচেয়ে ভাল জানি। রুশ বিপ্লব, ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধ, প্রতিরোধ, আফ্রিকা, এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ। এ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমার বাপ-ঠাকুর্দার জীবন কেটেছে।

আমার নিজের সময়ের ইতিহাসও আমি ভালই জানি। জানি সংবাদপত্র থেকে। বায়বিয়ানা স্কুলে সংবাদপত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া হয়, সকলে একসাথে, জোরে জোরে।

যখন পরীক্ষার জন্য তৈরি হই, মুখস্থ করি, তখন ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও দুটো ঘণ্টা চুরি করে নিই সংবাদপত্র পড়ার জন্য। সংবাদপত্রে যা থাকে তা দিয়ে পরীক্ষা পাশ করা যায় না। বুঝে দেখুন, আপনাদের পড়াশুনা আর পরীক্ষার সাথে জীবনের যোগ কত কম!

তাই তো আমাদের খবর পড়া এত দরকার। এইভাবেই তো আপনাদের মুখের উপর চিৎকার করে বলতে শিখব, আপনাদের সার্টিফিকেট নামক নোংরা কাগজগুলো আমাদের জানোয়ারে পরিণত করতে পারেনি। ডিপ্লোমা আমাদের লাগে আমাদের বাবা-মায়েদের খুশি করতে। কিন্তু রাজনীতি আর দৈনন্দিন খবর হল অন্য সব মানুষের দুঃখ-বেদনা-সংগ্রামের ইতিহাস, আপনার আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়।

● **সংবিধান** একজন শিক্ষিকা ঠিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এসে ইতিহাস পড়ানো দিলেন বন্ধ করে। যেখান থেকে ছাত্ররা জীবনের সাথে ইতিহাসকে মেলাতে পারত সেখানে এসে থেমে গেলেন তিনি। সারা বছরে কখনো তিনি ক্লাসে খবরের কাগজ পড়ে শোনাননি।

এখনো বোধ হয় ভদ্রমহিলার চোখের সামনে ফ্যাসিস্ট পোস্টারগুলো চেঁচিয়ে বলছে, "খবরদার, রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা নয়।"

জিয়ানপিয়েত্রোর মা ঐ মহিলাকে একদিন বলছিলেন, "আমার ছেলের খুব উপকার হয়েছে, জানেন, 'ডোপোস্কুওলাতে'[৮] ঢোকার পরে। রোজ সন্ধ্যের সময় ও পড়তে বসে যায়।"

শুনে শিক্ষিকা মহিলা আঁতকে উঠলেন, "পড়ে? কী পড়ে জানেন? পড়ে সংবিধান। কোনো মানে হয় ও পড়ার? গেল বছর ও খালি মেয়েদের কথা ভাবত, আর এখন ও মাথা ঘামাচ্ছে সংবিধান নিয়ে। যাচ্ছেতাই।"

বেচারী মায়ের মনে হল সংবিধান নির্ঘাৎ একটা অশ্লীল বই। সেদিন রাত্রে জিয়ানপিয়েত্রোকে এক চোট মার খাওয়াতে চাইলেন ওর বাবাকে দিয়ে।

● **মন্টি সাহেব** এই মহিলাই তাঁর ক্লাসে হোমারের "ইলিয়াড" থেকে গল্প পড়াতেন। ভাল। হোমার[৯] পড়া অবশ্যই ভাল। কিন্তু পড়াতেন তিনি ভিনচেনজো মন্টি[১০]-র অনুদিত হোমার।

৮: ইংরেজি অনুবাদকের টীকা: ডোপোস্কুওলা—ইটালিয়ান শব্দ। স্কুলের পরে যেখানে পঠনপাঠন করানো হয়। বারবিয়ানা স্কুলে এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা হ'ত।

৯: হোমার: প্রাচীন গ্রিক কবি। "ইলিয়াড" আর "ওডিসি"—এই দুই মহাকাব্যের রচয়িতা।

১০: ভিনচেনজো মন্টি: উনবিংশ শতকের ইটালিয়ান কবি। ইনি "ইলিয়াড" অনুবাদ করেন ইটালিয়ান ভাষায়।

বারবিয়ানাতে এই অনুবাদটি আমরা পড়তাম না। কেন জানেন? একবার মজা দেখার জন্য মূল গ্রিক "ইলিয়াড"-এর সাথে এই অনুবাদটি মিলিয়ে দেখেছিলাম। একটি স্তবকে দেখলাম মূল গ্রিকে আছে একশ'টি শব্দ। সেখানে মিশ্টিকৃত অনুবাদে সেই একই স্তবকে আছে একশ' চল্লিশটি শব্দ। অর্থাৎ, প্রতি তিনটি শব্দে একটি শব্দ মিশ্ট-র মস্তিষ্কপ্রসূত।

কে এই মিশ্ট? আমাদের কি শেখার কিছু আছে এঁর কাছে? ইনি কি এমন কোনো ভাষায় কথা বলেন যা আমাদের শেখা উচিত? আদপেই না। উনি যে ভাষা লিখতেন সে ভাষা তাঁর নিজের যুগের লোকেও ব্যবহার করত না।

একবার আমি একটি ছেলেকে ভূগোল পড়াচ্ছিলাম। ছেলেটি আপনাদের ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের পরীক্ষায় সদ্য ফেল করেছে। ভূগোল সে বিশেষ জানে না, কিন্তু জিব্রলটারকে সে বলে "পিলারস্ অব হারকিউলিস্"[১১]। ভেবে দেখুন, স্পেনদেশে ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে সে যদি বলে "পিলারস্ অব হারকিউলিস্"-এর দুটো টিকিট তার চাই, তাহলে কী হবে?

● **কোন্‌টা আগে** এই ক'টা দিন তো মোটে স্কুল চলে—উচিত নয় কি শুধুমাত্র খুব জরুরি বিষয়গুলোই স্কুলে পড়ানো?

ছোট্ট পিয়েরিনো, ডাক্তারবাবুর ছেলে। ওর প্রচুর সময় আছে গালগল্প পড়ে যাবার। জিয়ানীর নেই। পনেরো বছর বয়সেই ওকে আপনারা দূর করে দিয়েছেন। কারখানায় মজুর সে এখন। ওর জানার দরকারই নেই, জুপিটার মিনার্ভার জন্মদাতা, না মিনার্ভা জুপিটারের।[১২]

ওর পক্ষে ভাল হ'ত যদি ইটালিয়ান সাহিত্য পাঠক্রমে ধাতু শ্রমিক ইউ-নিয়নের চুক্তিপত্রটা থাকত। পড়েছেন নাকি, দিদিমণি, ঐ চুক্তিপত্রটা?

---

১১ : 'পিলারস্ অব হারকিউলিস্ : প্রাচীন কবিরা জিব্রলটার-এর এই নাম দিয়েছিলেন। ভূমধ্যসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী প্রণালীর এই নাম। হারকিউলিস্ গ্রিসের পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লিখিত একজন বীরের নাম। এখানকার বিরাট উঁচু স্তম্ভাকৃতি পাথরের নামকরণ এঁরই নামে।

১২ : প্রাচীন গ্রিকরা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত, অথবা বিশ্বাস করার ভান করত। কী বলত জানেন? জুপিটার (একজন পুরুষ দেবতা) গর্ভে ধরেছে মিনার্ভাকে (একজন মহিলা দেবী)।

পড়েননি। লজ্জা করে না আপনার? এর সাথে ইটালির পাঁচ লাখ পরিবারের জীবন জড়িত।

আপনারা নিজেদের খুব শিক্ষিত ভাবেন। আপনারা সকলেই একই পুঁথিপত্র পড়েছেন তো! আপনাদের তো আর কেউ অন্য কিছু বিষয়ে প্রশ্ন ধরে না!

● **বেচারার দল** জিমনাস্টিক পরীক্ষার দিন মাষ্টারমশাই আমাদের দিকে একটা বল ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "বাস্কেটবল খেল দেখি।" আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। খেলতে জানি না। অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়লেন তিনি, "বেচারা ছেলের দল।"

আপনাদেরই একজন, বুঝলেন। বাস্কেটবল খেলতে না জানাটা একটা ভয়ানক অপরাধ তাঁর মতে। প্রিন্সিপালকে নালিশ করে আমাদের সে বার ফেল করালেন উনি। "শরীরগঠন শিক্ষা" আমাদের একদম নাকি হয়নি।

আমরা প্রত্যেকে তরতর করে ওক গাছে উঠতে পারি। উপরে উঠে হাত ছেড়ে বসে কুড়ুল দিয়ে একশ' কেজি ওজনের একটা ডাল কেটে ফেলতে পারি। তারপর সেটাকে বরফের মধ্যে দিয়ে টেনে এনে ফেলতে পারি মায়ের দোরগোড়ায়।

ফ্লোরেন্স-এ এক ভদ্রলোক আছেন, বাড়িতে দোতলায় উঠতে তাঁর লিফ্‌ট লাগে। কিন্তু তিনি একটা খুব দামি যন্ত্র কিনেছেন এবং ঘরে বসে সেটাতে তিনি দাঁড় বাওয়ার ভান করেন। এঁকে নিশ্চয় আপনারা শরীরচর্চা পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর দিতেন।

● **ল্যাটিন শিক্ষা** বারবিয়ানাতে আমরা ল্যাটিন প্রায় পড়তাম না বললেই চলে। লোকসভা আইন করে তুলে দিয়েছে ল্যাটিন। ঐ বছর থেকে কেমব্রিজ আর অক্সফোর্ড[১৩]-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ল্যাটিন আর বাধ্যতামূলক বিষয় নেই।

কিন্তু মুজেলো অঞ্চলের কৃষকদের এখনও ভক্তিভরে ল্যাটিন পড়তে হয়। ভয়ানক গম্ভীর মাষ্টারমশাইরা ঘুরে ঘুরে তা পড়ান। ফুটো ঘটির দল।

অবাক হয়ে দেখি এই বিচিত্র লোকগুলোকে। আশ্চর্য ব্যাপার, সত্যি!

১৩: কেমব্রিজ আর অক্সফোর্ড: ইংল্যাণ্ডের দুই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত বড়লোকদের জন্য। ওখানে অল্পদিন আগেও ল্যাটিন না জানলে ভর্তি হওয়া যেত না।

নতুন ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল

● **আপনাদের হাতে** নতুন ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের জন্য প্রণীত নতুন আইন আর পাঠক্রমগুলো পড়ে দেখছিলাম আমরা।

বেশির ভাগটাই আমাদের ভাল লেগেছে। বিশেষ করে ভাল লেগেছে, কেন না নতুন ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলগুলো সত্যি সত্যিই চালু হয়েছে। সত্যিই এগুলো সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক। সবচেয়ে বড় কথা, দক্ষিণপন্থী দলবাজরা এগুলোকে অপছন্দ করে। এগুলো সত্যিই ইতিবাচক ব্যাপার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন? এগুলো আপনাদেরই হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছে। আবার আপনারা স্কুলগুলোকে শ্রেণীবৈষম্যের শিকারে পরিণত করতে চলেছেন নাকি, যেমন আগে ছিল?

● **স্কুলের দৈনন্দিন কর্মসূচী** পুরানো ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে শ্রেণীবৈষম্যের ভিত্তিই ছিল তাদের রোজকার রুটিন আর পাঠক্রম শেষ করার বাঁধা সময়। স্কুলে পড়ার সময়টা কম আর ছুটিটা লম্বা। নতুন ব্যবস্থাতে এ ব্যাপারটা বদলায়নি। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের জন্য একদম ঠিক ব্যবস্থা। যারা বাড়িতে পড়াশুনার সময় পাবে আর স্কুলে যাবে কেবল ডিপ্লোমা জোগাড় করতে।

নতুন আইনের ৩ নং ধারায় অবশ্য আশার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে "ডোপোস্কুওলা"র ব্যবস্থা করতে হবে, সপ্তাহে অন্তত তিন ঘণ্টা। কিন্তু ওই ধারাতেই আবার ছোট একটা ছিদ্র রাখা হয়েছে এই দায়িত্ব এড়ানোর জন্য। "ডোপোস্কুওলা" চালু করা হবে কেবলমাত্র "স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত" হওয়ার পরে। কাজেই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আবার ফিরে গেল আপনাদের হাতে।

● **ফল কী হল** নতুন ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল চালু হবার পর প্রথম বছরে ফ্লোরেন্স প্রদেশের একান্নটি শহরের মধ্যে পনেরোটিতে "ডোপোস্কুওলা" খোলা হল।

দ্বিতীয় বছরে কাজ চলল ছ'টি শহরে, ছাত্রদের শতকরা মাত্র ৭.১ ভাগ উপকৃত হল। গত বছর কাজ হয়েছে মাত্র পাঁচটি শহরে, কেবল ২.৯ ভাগ ছেলেদের জন্য।[১৪] আজ রাষ্ট্রীয় স্কুল ব্যবস্থায় একটিও "ডোপোস্কুওলা" আর

---

১৪ : ১৯৬৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী। রিপোর্ট দিচ্ছেন "সেন্টার ফর স্টাডিজ অব দি প্রব্লিম অব ফ্লোরেন্স।"

চালু নেই।[১৫]

আপনারা দোষ দেবেন অভিভাবকদের। কিন্তু তাঁদের কী দোষ? ওঁরা বোঝেন এ কাজে আপনাদের কোনো উৎসাহ নেই। নইলে, আপনারা এত ছাত্র পেতেন যে সামলে উঠতে পারতেন না।

● **বাধা** ভিচ্চিও-র মেয়র, "ডোপোস্কুওলা" শুরু করার আগে অঞ্চলের স্কুলশিক্ষকদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তেরোটা চিঠি এসেছিল বিপক্ষে, দু'টো এসেছিল প্রস্তাব সমর্থন করে। বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র যদি খুব ভাল করে চালানো না যায়, তাহলে এ কেন্দ্র খুলে কোনো লাভ নেই।

শহরে ছেলেরা রাস্তায় আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে, আর ভাঁটিখানায় নেশা করছে। গ্রামে ছেলেরা মাঠে গিয়ে খেটে মরছে। এ অবস্থায় কোনো শিক্ষাকেন্দ্রই ভয়ানক কিছু খারাপ হ'ত না। যে কোনোরকম কেন্দ্রই কাজে আসত। এমনকি আপনাদের ঐ আধখেঁচড়া স্কুলগুলোও যথেষ্ট উপকারে আসে।

তা যাঁরা এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র খোলার বিপক্ষে তাদের বলে রাখি, নিন্দুকেরা কিন্তু অন্য কথা বলবে। বলবে, আপনারা আবার "প্রাইভেট টিউশন"-এর ধান্দা করছেন না তো? পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেদের বিকেলে পড়িয়ে কিছু অতিরিক্ত পয়সা রোজগারের চেষ্টায় নেই তো আপনারা?[১৬]

● **দক্ষিণ আফ্রিকা** কিছু লোক সমতাকে ঘেন্না করে।

ফ্লোরেন্স-এর একটি স্কুলের অধ্যক্ষ এক ছাত্রের মা-কে বলেন, "একটুও চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলেকে পাঠান আমাদের স্কুলে। সারা ইটালিতে আমাদের স্কুলের মতো অভিজাত প্রতিষ্ঠান আর একটিও নেই। আমরা শ্রেণী-বৈষম্য খুবই মানি।"

"সার্বভৌম জনগণ"-কে ঠকানো খুব সোজা। "ভাল" ছেলেদের জন্য একটা বিশেষ ক্লাস খুলুন, তাহলেই হবে। এই ছেলেদের প্রত্যেককে আলাদা

---

১৫ : এঁরাই বলছেন গত কয়েক বছর পরীক্ষামূলকভাবে যে কাজ করা হয়েছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কারণ শিক্ষকদের মধ্যে এ বিষয়ে অত্যন্ত নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।

১৬ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : কলকাতার শিক্ষকরা কী বলেন, এ বিষয়ে?

করে চেনার দরকার নেই। ওদের পরীক্ষার ফলাফল দেখুন, বয়স দেখুন, ঠিকানা (গাঁ না শহর) দেখুন, জন্মস্থানের (উত্তর ইটালি না দক্ষিণ) খবর নিন, বাবা কী চাকরি করেন জানুন, আর কোন্ কোন্ তরফ ওদের পৃষ্ঠ-পোষক সে খবর নিন — তাহলেই হবে।

একই স্কুলে এইভাবে দুটো, তিনটে, এমনকি চারটে পর্যন্ত ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল বর্তমান থাকতে পারে। সেকশন "এ" হল সেরা ছাত্রদের শ্রেণী। যে শ্রেণী সুন্দরভাবে চলে। সবচেয়ে ভাল শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে লড়ে যাবেন এই শ্রেণীকে পড়াবার সুযোগ লাভের জন্য। এক ধরনের অভিভাবক যে কোনো মূল্যে চেষ্টা করবেন তাঁর ছেলেকে এই শ্রেণীতে বসাতে। সেকশন "বি" হবে একটু কম ভাল। সেকশন "সি" আরো কম। কমতে থাকবে ক্রমান্বয়ে।[১৭]

● **ঠেলেঠুলে এগোতে হবে তো** কিন্তু এঁরা সবাই সম্মানিত ব্যক্তি। অধ্যক্ষ আর শিক্ষকরা "ভাল" ছেলেদের আলাদা কি আর নিজেদের স্বার্থে করছেন? করছেন "উন্নততর সংস্কৃতি" সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

এমনকি অভিভাবকরাও এতে মদত দিচ্ছেন নিঃস্বার্থভাবেই। তাঁরা কেবল তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছেন। নিজের স্বার্থে গোঁত্তা মেরে অন্যকে ঠেলে এগোনো ঠিক নয়। কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য এ কাজ করা তো পবিত্র কর্তব্য। না করাটাই তো লজ্জার হবে।

● **কী আর করা যাবে** অভিভাবকদের মধ্যে যাঁরা গরিব মানুষ তাঁরা এসব কিছুই পারেন না। কি যে ঘটছে তা তাঁরা ধরতেই পারেন না। বরঞ্চ, তাঁরা বেশ বিগলিতই হয়ে পড়েন। তাঁদের সময়ে, গাঁয়ের লোকে ন'বছর বয়স হলেই কাজে লেগে যেত পড়াশুনা ছেড়ে।

ঠিকমতো পড়াশুনা শিখছে না তাঁদের ছেলেমেয়ে? তাঁদের বাচ্চারাই তাহলে পড়াশুনা শেখার যোগ্য নয়। কী বলেন তাঁরা এ বিষয়ে? বলেন,

---

১৭। বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য: এই কলকাতাতে বেশ কয়েকটি "অভিজাত" স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু আছে। কোনো এক নামজাদা স্কুলে যেমন, "সি" সেকশনে রাখা হ'ত কেবল "মেধাবী" ছাত্রদের। এ ব্যবস্থা ওখানে অবশ্য এখন নেই। বড্ড বেশি রেষারেষি শুরু হয়ে গেছিল অভিভাবক-দের মধ্যে।

"মাস্টারমশাই তাই তো বললেন। অত্যন্ত ভদ্রলোক তিনি, জানো। আমাকে বসতে বললেন। খোকা কী কী নম্বর পেয়েছে দেখালেন। ওর খাতা দেখালেন। দেখলাম তো, সব লাল কালি দিয়ে ঢেঁড়া দেওয়া। কী আর করা যাবে, আমার ছেলেটাই মূর্খ। যাক, মাঠে গিয়ে হাল ঠেলুক আমাদের মতো।"

প রি সং খ্যা ন

কেউ কেউ এখানে আপত্তি তুলে বলতে পারেন, আমরা নিশ্চয় সবচেয়ে খারাপ স্কুলগুলো থেকে পরীক্ষা দিয়েছি, তাই অবস্থা এত শোচনীয়। আর, অন্য সব তথ্য যেখান থেকে যা পেয়েছি ঘটনাচক্রে সেগুলো সবই দুঃখজনক হয়েছে। বলতে পারেন, আপনাদের হাতে এমন অনেক তথ্য আছে, যা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে আসা যায়।

কিন্তু সারা দেশের হিসাব যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের কথাই সত্যি প্রমাণিত হবে।

পনেরো বছরের ছেলে জিয়ানকারলো। তাকে আপনারা শিক্ষার অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। ফেল করেছিল সে প্রায় সব বিষয়ে। অঙ্ক ছিল তার কাছে একটা শুকনো জিনিস।

তাকে আমরা বললাম, দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার ফেল করা ছেলে আছে দেশে। তোমারই মতো তারা মাঠে-ময়দানে ঘুরছে। এসো, তাদের সম্পর্কে হিসাবপত্র ঘেঁটে দেখা যাক।

চার মাস ধরে হিসাবপত্রের মধ্যে ডুবে রইল জিয়ানকারলো। অঙ্ক তার এখন আর শুকনো লাগে না। অজস্র নথিপত্র ঘাঁটা হল, অনেক স্কুলে ঘোরা হল, চিঠিপত্রে খবরাখবর সংগ্রহ করা হল, অনেকবার যাওয়া হল শিক্ষামন্ত্রকে আর কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরে। দিনের পর দিন, অনেক যোগ-বিয়োগ করা হল ক্যালকুলেটর নিয়ে।

আহরিত সব তথ্য থেকে আমরা যে সব সিদ্ধান্ত পেলাম, তা থেকেই সাজিয়েছি আমাদের বক্তব্য। সাদা কথায়। সোজা ভাষায়।

অবাক হয়ে দেখছি, মাস্টারমশাইরা কেউ জানেন না, কী ঘটছে শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতরে।

একজন শিক্ষক আমাদের স্কুল দেখতে এসেছিলেন। কথাটা তাঁকে বলতেই তিনি ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন। "তেরো বছর আমি শিক্ষকতা করছি। বহু সহস্র ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তোমরা পুরো ব্যাপারটা দেখছ বাইরে থেকে। একটা স্কুলের ভিতরে কী ধরনের সমস্যা থাকে তা তোমরা গভীরভাবে তলিয়ে বোঝো না।"

বুঝে দেখুন। উনি নাকি "গভীরভাবে" বোঝেন। উনি তো শুধু বাছাই করা ছেলেমেয়েদের দেখেছেন। আর এরকম যত ছাত্রছাত্রী উনি দেখেন, ততই উনি উল্টো বোঝেন।

স্কুলগুলোর আসল সমস্যা তো একটাই। ছেলেমেয়েরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। জিয়ানীর মতো।

আপনাদের "বাধ্যতামূলক স্কুল" থেকে বছরে চার লক্ষ বাষট্টি হাজার ছাত্র খসে পড়ে।[১৮] এর জন্য দায়ী কে? দায়ী আপনারা। এরা কোথায় গেল তা দেখতে তো যানই না আপনারা, এদের কথা ভেবেও দেখেন না। আমরা কিন্তু তা করি না। আমরা এদের খুঁজি ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়। আমরা এদের খুব ভাল করে চিনি।

জিয়ানীর মা লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু স্কুলগুলোর সমস্যা তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট। একজন শিশু যখন পরীক্ষায় ফেল করে তখন তার মানসিক যন্ত্রণা কেমন হয় তা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই এ সমস্যা বুঝবেন। ধৈর্য ধরে বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে দেখলেই সমস্যার চেহারাটা পরিষ্কার হবে।

---

১৮ : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী। বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : ভারতের অবস্থা এক্ষেত্রে সমান শোচনীয়। প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে স্কুল ছাড়ে ৬৩·১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে ছাড়ে ৭৭·১ শতাংশ। এরা বেশির ভাগই গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে। যদিও স্কুল ছাড়ার কারণ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়।

(সূত্র : দশরথ দেব : "প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি কোন্ পথে" পুস্তিকায় সংকলিত, পৃঃ ৫-৬)

জন্মেই আলাদা ?

● **ফেল করে বেশি কারা ?** ১৯৬৫ সালের ইটালিয়ান বাৎসরিক পরিসংখ্যান সংকলন ঘেঁটে দেখলে একটা অদ্ভুত তথ্য নজরে পড়বে। যে সব পরিবারের ছেলেরা "আপার স্কুল ডিপ্লোমা" লাভ করে সেই সব পরিবারের কর্তাদের চাকুরির ধরন সম্পর্কে এই সংকলনে একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ব্যবসাদার অথবা ডাক্তার, অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার, স্কুল মাষ্টারদের ছেলেরা তিরিশ জনের মধ্যে তিরিশ জনই পাশ করে। ম্যানেজার এবং কেরানিদের ছেলেদের তিরিশ শতাংশের মতো, নিজস্ব ছোট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ছেলেদের প্রায় বারো শতাংশ এবং কলে-কারখানায় নিযুক্ত মজুর শ্রমিকদের ও কৃষকদের ছেলেদের মাত্র তিন শতাংশ এই ডিপ্লোমা লাভ করতে সক্ষম হয়।

অর্থাৎ, পরীক্ষার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে ছাত্রদের পারিবারিক অবস্থার উপর।

এই ছেলেরা সকলেই কিন্তু আপনাদের স্কুলে বারো তেরো বছর পড়ে এসেছে। এর মধ্যে আট বছর ছিল আবার বাধ্যতামূলক।

● **সমস্যাটা শুধু আর্থিক নয়** ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকে স্কুল ছাড়ে অর্থাভাবে। সে ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু এমন অনেক শ্রমিক আছেন যাঁরা অনেক কষ্ট করে হলেও সন্তানকে দশ এগারো বছর স্কুলে পড়ান যাতে তারা অন্তত তৃতীয় ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস পর্যন্ত পাশ করতে পারে।

তাঁরা পিয়েরিনোর বাবা ডাক্তারবাবুর চেয়ে কম টাকা খরচ করেন না। অথচ পিয়েরিনো ষোল বছর বয়সের মধ্যেই তার "আপার স্কুল ডিপ্লোমা" পেয়ে যায়। আর শ্রমিকের ছেলেরা করে ফেল।

● **মূর্খ আর অলস** আপনি বলবেন, আমি শুধু মূর্খ আর অলস ছাত্রদেরই ফেল করাই।

বলেই বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় মূর্খ আর অলস ছেলেরা গরিবের ঘরেই জন্মায়। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছে করে গরিবদের এভাবে বঞ্চিত করবেন না কখনোই। প্রবঞ্চক হলেন আসলে আপনি।

● **জাত্যাভিমান** লোকসভার সদস্য এক ফ্যাসিস্ট "ভদ্রলোক" বলেছিলেন, "বাধ্যতামূলক" স্কুল করার কোনো মানে হয় না, কারণ কিছু বাচ্চা আছেই

যারা লেখাপড়া শিখতে পারবে না কিছুতেই। জন্মগত কিছু খামতি থাকে এদের।

একটি ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক লিখেছিলেন, "দুঃখজনক হলেও সত্যি কথা হল এই যে, সব শিশুর মানসিক উন্নতি একইরকম হবে অথবা তাদের শিক্ষাগ্রহণের সামর্থ্য একই মানের হবে, এমন নিশ্চয়তা সংবিধান দিতে পারবে না কখনোই।[১৯] কিন্তু নিজের ছেলের সম্বন্ধে এই কথা ভদ্রলোক বলতে পারতেন কি? ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে ফেল করাবেন কি নিজের ছেলেকে? মাঠে কাজ করতে পাঠাবেন তাকে? মাও জে দঙ-এর চিন দেশে নাকি পয়সাওয়ালা লোকদের ছেলেমেয়েকে মাঠে পাঠানো হয়েছে কাজ করতে, শুনতে পাই। সত্যিই যদি হয়ে থাকে তো ভাল কথা।

● **অন্য লোকের ছেলেমেয়ে** অন্য লোকের ছেলেমেয়েদের অনেক সময়ই নির্বোধ বলে মনে হয়। নিজেদের সন্তানকে কিন্তু কখনোই তা মনে হয় না। শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকলে বোঝা যায় তারা আদৌ বোকা নয়। অলসও নয়। একটু-আধটু আলস্য বা বুদ্ধির অভাব যা থাকে তা দেখলে বোঝা যায়, কিছুদিন পড়াশুনা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, এ একটা সাময়িক ব্যাপার, অথবা, কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে শিশুকে ত্রুটিমুক্ত করার।

তাহলে এই কথা বলা উচিত নয় কি যে, সব শিশুই জন্ম থেকে সমান? পরে যদি সমতার অভাব ঘটে, তার জন্য আমরাই দায়ী? আমাদেরই এর প্রতিকার করতে হবে?

১৯: পারিবারিক অবস্থার সাথে পাশ-ফেলের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিষয়ে মন্তব্য চাওয়ায় একজন প্রধান শিক্ষক ও আঠারো জন শিক্ষক সই করে একটি চিঠি দেন। এ কথাটা তারই মধ্যে আছে।

বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য: কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ১৯৭৩ সালের বার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বনেদি শিক্ষার্থীদের বিশেষ দাবীর সমর্থনে বলা হয়: "অভিজাততন্ত্র? হ্যাঁ, তাই। যত দুঃখজনকই হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি যে, সকলের পক্ষে ভাল পারমাণবিক পদার্থবিদ বা বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক বা ভাল অর্থনীতি-বিদ, এমনকি ভাল অধ্যাপক হওয়া সম্ভব নয়? এসব ব্যক্তিরা হলেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। এঁদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে বৈকি।"

● **বাধা হটাও** সংবিধান ঠিক এই কথাই বলে, জিয়ানীর কথা মনে রেখে : "আইনের চোখে সব নাগরিক সমান, তার জাতি বা ভাষা যাই হোক না কেন, ব্যক্তিগত বা সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন।

যে সব অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা নাগরিকবৃন্দের স্বাধীনতা বা সাম্যকে ব্যাহত করে, মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে সমস্ত শ্রমিকের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণে অন্তরায় হয়, সেই সব অবস্থাকে দূরীভূত করা সাধারণতন্ত্রের কর্তব্য।" (ইটালির সংবিধানের ৩ নং ধারা)[২০]

সবটাই ছিল আপনার হাতে

● **ঝাড়ুদার** আপনারই একজন সহকর্মী (সুন্দরী বিবাহিতা তরুণী তিনি। স্বামীর সাথে তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির একজন লড়াকু সদস্যা। তিনি তার প্রথম ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে আঠাশ জনের মধ্যে দশ জনকে ফেল করিয়েছিলেন)। আমাদের কাছে যুক্তি দেখালেন, "আমি তো আর ওদের তাড়িয়ে দিইনি। কেবল ফেল করিয়েছি। তা ওদের বাবা-মায়েরা যদি ওদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার দিকে নজর না দেন, সেটা ওঁদেরই দায়।"

● **জিয়ানীর বাবা** কিন্তু জিয়ানীর বাবা করবেন কি? তিনি বারো বছর বয়সে কামারশালায় কাজে লাগেন। চার বছরও স্কুলে পড়েননি।

উনিশ বছর বয়সে পার্টিজান[২১] বাহিনীতে যোগ দেন তিনি। তিনি কী করছেন সেটা খুব ভাল করে না বুঝেই। কিন্তু আপনাদের চেয়ে তিনি বেশি বুঝেছিলেন। এমন একটা পৃথিবীর জন্য তিনি লড়তে গিয়েছিলেন যেখানে জিয়ানী হবে অন্য সকলের সমান। জিয়ানী তখন জন্মায়ওনি।

সংবিধানের ৩ নং ধারার অর্থ তাঁর কাছে হল, "...সেই সব অবস্থাকে

---

২০ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : ভারতীয় সংবিধান এ বিষয়ে কী বলে ?

২১ : বাংলা অনুবাদকের টীকা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সারা ইটালিতে ফ্যাসিস্ট-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এবং মিত্র শক্তিকে সাহায্য করতে যে গেরিলাবাহিনী গড়ে উঠেছিল তারই নাম ছিল পার্টিজান বাহিনী।

দূরীভূত করার দায়িত্ব শ্রীমতি স্প্যাডোলিনির (একজন স্কুল শিক্ষিকা)।"

আপনাকে জিয়ানীর বাবাই কিন্তু মাইনে দেন। ভাল টাকাই দেন। ঘণ্টায় তিনি পান ৩০০ লিরা, মাসে আপনাকে দেন ৪৩০০ লিরা।[২২]

আরও একটু বেশি মাইনে দিতেও ওঁর কোনো আপত্তি হ'ত না যদি আপনি আরও একটু বেশি সময় দিতেন পড়ানোর কাজে। জিয়ানীর বাবা বছরে ২,১৫০ ঘণ্টা কাজ করেন। আপনি কতক্ষণ করেন ? ৫২২ ঘণ্টা।[২৩] (পরীক্ষা নেওয়ার সময়টা বাদ দিচ্ছি। ওই সময়টাকে পঠনপাঠনের সময় বলা চলে না।)

● **কী করবেন জিয়ানীর বাবা** যে সব বাধা জিয়ানীকে চেপে রাখে জিয়ানীর বাবা সে সব বাধা নিজে নিজে কখনো সরাতে পারবেন না। ইণ্টার-মিডিয়েট-এর একজন ছাত্রকে কী করে পরিচালনা করা যেতে পারে তা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভবই নয়। কতক্ষণ ছেলের পড়াশুনা করা উচিত, পড়ার বাইরে অন্য ব্যাপারে মন দেওয়া প্রয়োজন কিনা, এসব তিনি জানবেন কী করে ? পড়লে মাথা ধরে কিনা, জিয়ানী যে বলে পড়লে তার চোখ কট্ কট্ করে, তা সত্যি কিনা, এ সব তাঁর ধারণাতেই আসে না।

সবই যদি জিয়ানীর বাবা পারতেন তাহলে ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর তো দরকারই হ'ত না। জিয়ানীকে লেখাপড়া শেখানো আর সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া আপনার কাজ। এ সমস্যা দুটি সমাধানের দায়িত্ব আপনার।

আপনি যদি ওকে পথ দেখান, তাহলে জিয়ানী আপনার সাথে অন্যভাবে

---

২২ : ১৯৬৬ সালে একজন ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল শিক্ষকের, ট্যাক্স কাটার পরে, সর্বনিম্ন বেতন ছিল বছরে ১২,২৩,০০০ লিরা (৮৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ কম-বেশি ১৩,২৮০ টাকা) এবং সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৩৩,১১,০০০ লিরা (২২৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ কমবেশি ৩৬,০০০ টাকা)। সারা বছরে কাজের সময় ছিল সর্বনিম্ন ৪৬৮ ঘণ্টা এবং সর্বোচ্চ ৫৫০ ঘণ্টা। এখানে ঘণ্টা হিসাবে একজন শিক্ষকের গড়পড়তা আয়ের কথা বলা হয়েছে।

২৩ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ও কলেজ শিক্ষকরা বছরে কত ঘণ্টা কাজ করেন তার একটা মোটামুটি হিসাব করলে যে তথ্য বেরোবে তা বাস্তবিকই অতীব বিস্ময়কর। দেখা যাবে, একজন স্কুল শিক্ষক পড়ান বছরে ৬৭৬ ঘণ্টা। একজন কলেজ শিক্ষক সর্বসমেত "লেকচার" দেন বছরে মোট ৩৪০ ঘণ্টা। পরীক্ষায় পাহারাদারী, খাতা দেখা (কলেজের, স্কুলের এবং কাউন্সিল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার) এবং

কাজ করতে পারবে, ভবিষ্যতে অনেক বেশি দক্ষ পিতা হয়ে নিজের সন্তানদের পরিচালনা করতে পারবে সে। কিন্তু এখন তো জিয়ানীর বাবা অক্ষম তাঁর সন্তানকে দেখতে। পয়সাওয়ালা লোকেরাই তাঁকে অক্ষম করে রেখেছে।

● **কোচিং** বেচারি জিয়ানীর বাবা। যদি জানতেন বাস্তবিক কী ঘটছে, তাহলে নিশ্চয় আবার অস্ত্র হাতে পার্টিজান বাহিনী গড়তেন। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা অবসর সময়ে টাকা নিয়ে প্রাইভেট কোচিং করেন। বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে তফাৎ দূর করার বদলে তাদের মধ্যে তফাৎটা আরও বাড়িয়ে তোলেন।

সকালে—স্কুলের নিয়মিত সময়ে—আমরা তাঁদের পয়সা দিই একইভাবে সকলকে শিক্ষাদান করার জন্য। বিকালে তাঁরাই আবার বড়লোকদের কাছ থেকে পয়সা নেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের আলাদা করে সেই একই শিক্ষা বিশেষভাবে দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে। তারপর, আমাদেরই খরচে বছরের শেষে পরীক্ষা নামক বিচারের প্রহসনে বিচারকের ভূমিকা নেন তাঁরাই, বড়লোক, গরিব লোকের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তফাৎ নির্ধারণ করতে।

নিজের তৈরি হওয়ার জন্য পড়ার সময়টা বাদ দেওয়া হয়েছে হিসাব থেকে। বিশেষ স্কুল বা বিশেষ কলেজের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলো কমতে, বাড়তে পারে।

দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন সংযোজন : উপরের হিসাব নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল খুব। তাই এখানে নতুন করে হিসাব দিচ্ছি। বেশ খানিকটা বাড়িয়ে। শিক্ষকদের কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আইন মোতাবেক সবচেয়ে বেশি যে সময়টা বেঁধে দেওয়া আছে, নতুন অঙ্ক অনুযায়ী। প্রাথমিক শিক্ষকদের দিনে সাড়ে তিন ঘণ্টা ক্লাস নেওয়ার কথা। সেই হিসাবে, বছরে তিন মাস ছুটি ধরলে, তাঁদের কাজের সর্বমোট সময় হল বছরে ৭৫৬ ঘণ্টা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের দিনে সোয়া চার ঘণ্টা ক্লাস নেওয়ার কথা। সে হিসাবে তাঁরা বছরে কাজ করেন ৯১৮ ঘণ্টা। আইন অনুযায়ী কলেজ শিক্ষকদের সপ্তাহে কর্মভার হল চব্বিশ পিরিয়ড, এক একটা পিরিয়ডে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অর্থাৎ সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা। তার মানে, বছরে চার মাস ছুটি ধরলে একজন কলেজ শিক্ষক বছরে কাজ করেন ৫৭৬ ঘণ্টা। ছুটি এর চেয়ে বেশিই থাকে। সপ্তাহে চব্বিশ পিরিয়ড ক্লাসও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় না।

● **একজন কেরানি** যদি কোনো কেরানি বাড়তি পয়সা নিয়ে বাড়িতে বসে কোনো কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে করে, অথচ অফিসে সেই একই কাজে ফাঁকি দেয়, তাহলে আপনি তাকে শাস্তি দিতে চাইবেন।

যদি কোনো কেরানি কাউকে ফিসফিস করে বলে, "এই অফিসে আপনার কাজগুলো দেরি করে করা হবে, ইচ্ছে করে এলোমেলো ফেলে রাখা হবে আপনার কাগজপত্র। আপনি বরং বাড়তি কিছু দিয়ে কাউকে লাগিয়ে বাড়িতেই কাজটা করিয়ে নিন", তাহলে তাকে জেলে দিতে বলবেন আপনি।

এক শিক্ষককে আমি বলতে শুনেছিলাম, কোনো এক মা-কে, "আপনার ছেলের নিজের দ্বারা কিছু হবে না। ওর জন্য মাষ্টার রাখুন।" ঠিক এই কথা বলেছিলেন "ভদ্রলোক"। সাক্ষী হাজির করতে পারি। মামলা দায়ের করতে পারি। কিন্তু এই লোকটিকে কেউ জেলে পাঠাবে না।

মামলা উঠবে যার কোর্টে, দেখুন গিয়ে সেই জজসাহেবের বৌ-ই হয়তো কোচিং করে কিছু বাড়তি উপার্জন করেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে ইটালিয়ান দণ্ডবিধিতে এই অপকর্মটি কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে পরিগণিত নয়।

● **পেঁয়াজ চুরি** আপনারা সকলেই একটা বিষয়ে একদম একমত। আমাদের পিষে ফেলতে হবে। তা পিষে ফেলুন। কিন্তু যা করবেন তা সোজাসুজি করুন। সততার ভান করবেন না। সৎ হওয়া খুব সোজা। নীতিগুলো তো আপনাদেরই সৃষ্টি, আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী।

আমার এক পুরানো বন্ধু চল্লিশটা পেঁয়াজ চুরি করেছিল। জজসাহেব তাকে তেরো মাসের জেল দিলেন, কোনো ক্ষমা নেই। জজসাহেব অবশ্যই পেঁয়াজ চুরি করেন না। বড্ড ঝামেলা। তিনি ঝি-কে পাঠান পেঁয়াজ কিনতে। পেঁয়াজ কেনার টাকা আর ঝি-কে মাইনে দেবার টাকা অবশ্য আসে জজসাহেবের স্ত্রী-র কোচিং-এর রোজগার থেকে।

● **স্বাধীনতা** আরেকটা বাধা যেটা সরাবার কোনো চেষ্টাই আপনারা করেন না—তা হল ফ্যাশনের দাসত্ব।

একদিন টেলিভিশন সম্পর্কে কথা বলতে বলতে জিয়ানী আমাদের বলেছিল, "ওরা কেবল আমাদের এই যাচ্ছেতাই জিনিসগুলো গেলাচ্ছে, আমাদের যদি স্কুলে নিয়ে যেত তাহলে আমরা লেখাপড়াই করতাম।"

"ওরা" বলতে জিয়ানী বোঝাচ্ছিল তার চারপাশের সমাজ, পৃথিবী, আর "ঐ তাকে", যাকে জিয়ানী স্পষ্ট করে চেনে না, কিন্তু জানে যে সেই গরিব

লোকের জীবনধারা অলঙ্ঘনীয়ভাবে নির্ধারিত করে দেয়।

আমরা ওকে খুব গাল দিলাম, বললাম, "তুমি তো দু-দুটো স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েও নাওনি।" কিন্তু আপনাকে চুপি চুপি বলি, সত্যিই কি ওর সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল?

শহরে তাকে চারদিক থেকে চেপে ধরে নানা রকমের প্রলোভন আর "ফ্যাশনের" চাপ। এটা না করলে হবে না, ওটা না করলে তুমি "আধুনিক" নও। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে যে ধরনের সাহস দরকার, মনের জোর দরকার তা জিয়ানীর মতো অশিক্ষিত, ছেলেমানুষ ছেলে কোথায় পাবে? তাকে পথ দেখাবার মতো কেউ তো নেই। বাবার কাছ থেকে সে কোনো সাহায্য পায় না। তিনিও ওই একই ব্যবস্থার শিকার। অঞ্চলের পাদ্রির কাছ থেকে সে কোনো সাহায্য পায় না, তিনি নানা ধরনের "খেলা" বিক্রি করেন ক্যাথলিক ইটালিয়ান শ্রমিক সমিতির দোকানে বসে। কমিউনিস্ট পার্টিও সেই একই কাজ করছে তাদের পরিচালিত ক্লাবগুলোতে বসে। সকলে মিলে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে জিয়ানীকে আরও, আরও নিচে টেনে নামাবার।

আমাদের স্বভাব এবং শারীরিক প্রবণতাগুলো আমাদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন করে, তার সাথে এইসব যুক্ত হয়ে অবস্থাটা কী দাঁড়ায় ভাবুন তো!

● **কত রকম ধারণা** একটা চলতি ধারণা হল এইরকম। বারো থেকে একুশ, এই বয়সটা হল খেলাধুলো, প্রেম-ভালবাসা নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়। পড়াশুনা এই বয়সের ছেলেমেয়েরা চায় না।

বারো থেকে পনেরো বছর বয়সটা হচ্ছে ভাষা আয়ত্ত করার সবচেয়ে ভাল সময়। আর পনেরো থেকে একুশ হচ্ছে সেই ভাষা ইউনিয়নের কাজে আর রাজনৈতিক সভায় ব্যবহার করার প্রকৃষ্ট বয়স। কিন্তু এই কথাগুলো জিয়ানীর কাছে গোপন করা হয়েছে।

এও তাকে বলা হয়নি যে তার সামনে সময় বড় কম। পনেরো বছরে স্কুল শেষ। একুশ বছর থেকেই হাজারটা ব্যক্তিগত সমস্যা তাকে ঘিরে ফেলবে। প্রেম, বিয়ে, ছেলেমেয়ে, রুজিরোজগার। আর মিটিং-এ যাবার সময় থাকবে না তার হাতে, নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পেতে হবে, সংসারের বাইরে সময় দেওয়া তার পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে অসম্ভব।

● **গরিবের স্বার্থরক্ষা** ফ্যাশনের এই অত্যাচারের হাত থেকে গরিব মানুষদের বাঁচাতে পারতেন আপনারা শিক্ষকরা। সরকার এ কাজ করার জন্য

বছরে আপনাদের ৮০০ হাজার মিলিয়ন লিরা বেতন দেয়।[২৪]

কিন্তু শিক্ষক হিসাবে আপনারা খুব ছোট মাপের। বছরে ১৮০ দিন ক্লাস করান, আর ছুটি দিয়ে রাখেন ১৮৫ দিন।[২৫] চার ঘণ্টা স্কুল তো বারো ঘণ্টা ছুটি। কোনো এক মূর্খ প্রিন্সিপাল ক্লাসরুমে ঢুকে ঘোষণা করে, "৩রা নভেম্বর তারিখে স্কুল বন্ধ রাখতে অনুমতি দিয়েছেন শিক্ষা অধিকর্তা। নতুন একটা ছুটির দিন।" ক্লাসে একটা হর্ষধ্বনি ওঠে, প্রিন্সিপালের মুখে একটা আত্মতৃপ্ত হাসি দেখা দেয়।

আপনারা স্কুলকে এমন একটা বিরক্তিকর ব্যাপারে পরিণত করেছেন যে, ছাত্রছাত্রীরা স্কুলকে ভালবাসতে শেখেই না।

● **আসুন, পরস্পরের পিঠ চাপড়াই** বরগো শহরে প্রিন্সিপাল একটা শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে দিয়েছেন তৃতীয় ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের নাচঘর করার জন্য। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেলেসিয়ানী মঠ (Salesiani Order) তাদের প্যারোকিয়াল (Parochial) অর্থাৎ স্থানীয় গির্জার স্কুলে একটা জৌলুসের আয়োজন করেছে যেখানে সকলে যাবে মুখোশ পরে। একজন শিক্ষককে আমি জানি যার পকেটে সব সময় উঁকি

২৪ঃ বাংলা অনুবাদকের টীকাঃ পশ্চিমবঙ্গে একজন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক চাকরির শুরুতে মাইনে পান ২৬২৬ টাকা। একজন মাধ্যমিক শিক্ষক পান প্রায় ৩৫৩৪ টাকা এবং একজন কলেজ শিক্ষক পান কমবেশি ৭০০০ টাকা। কোনো শ্রমিকের মাসিক রোজগার এবং কাজের সময়ের গড়পড়তা হিসাব এখানে না করাই বোধ হয় ভাল।

২৫ঃ এর মধ্যে ৩০ দিন আবার পরীক্ষা চলে। এই সময়টাতে ছেলেরা স্কুল খোলা আছে বলে মনে করে না।

বাংলা অনুবাদকের মন্তব্যঃ কলকাতার স্কুল কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা অনুরূপ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য প্রায় সব কলেজ বছরে দু'বার. উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য একবার, মোট তিনবার, দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে। কোনো কোনো কলেজে একই বাড়িতে তিনটি আলাদা কলেজ (সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়) থাকায় দুপুরের কলেজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। কারণ তিনটি কলেজই পরীক্ষার সময় দুপুরের কলেজের প্রাপ্য জায়গা দখল করে। উচ্চ মাধ্যমিক কর্তৃপক্ষ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অভিযোগ করে কোনো লাভ হয় না।

মারে একটা খেলাধুলো সম্পর্কিত পত্রিকা।

এঁরা সকলে নাকি ছেলেমেয়েদের "প্রয়োজন" সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল। আসলে, দুনিয়াটা যেমন চলছে চলুক, এরকম ভেবে নেওয়া খুব সহজ কাজ। ফলে, যে শিক্ষক আর যে শ্রমিকপিতা দু'জনেই খেলার কাগজ পড়তে ভালবাসেন, তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাঁরা কথা বলেন শ্রমিকপিতার সেই ছেলের সম্পর্কে, যে সবসময়ে ফুটবল বগলে ঘোরে অথবা সেই মেয়ের সম্পর্কে, যে মেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায় বিউটি পারলারে।

তারপর? শিক্ষক মার্কশিটে একটা ছোট্ট ঢেঁড়া দিয়ে দেন আর শ্রমিকের ছেলেদের পড়তে শেখার আগেই কাজে ঢুকে পড়তে হয়। কিন্তু শিক্ষকের ছেলেমেয়েরা? তারা লেখাপড়া চালাতে পারে একেবারে শেষ পর্যন্ত—"ইচ্ছে" না করলেও। "কিচ্ছু না বুঝলেও।" কারো কারো জন্য ভাল ছাত্র বাছাই করাটা অবশ্য খুবই সুবিধাজনক।

● **ভাগ্য, না পরিকল্পনা?** কেউ কেউ বলবেন সবই ভাগ্য। ইতিহাসে সবই ভাগ্যের খেলা, এ কথা ভেবে নিতে পারলে বেশ শান্তিতে থাকা যায়।

কিন্তু ইতিহাস আর রাজনীতি জড়িয়ে গেলেই মুশকিল। তখন ফ্যাশন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় জিয়ানীদের স্কুলের বাইরে রাখার জন্য যত্ন করে সাজানো ষড়যন্ত্র। নিরপেক্ষ অ-রাজনৈতিক শিক্ষক হয়ে দাঁড়ান চার লক্ষ এগারো হাজার কর্মঠ মুখের একজন, যাদের হাতে মালিক অস্ত্র হিসাবে তুলে দিয়েছে একটি করে নম্বর দেবার খাতা আর কতগুলো মার্কশিট। বছরে দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার জিয়ানীকে থামাবার দায়িত্ববাহী গুপ্তবাহিনী। ফ্যাশন যদি ওদের থামাতে না পারে তাহলে যুদ্ধে নামবে এই বাহিনী।

দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার ছেলেমেয়ে বহিষ্কৃত হয় বছরে। আপনাদের তথাকথিত স্কুলের বুলিতে এদের বলা হয় "রেসপিস্তি"[২৬]। এই শব্দটা কিন্তু সামরিক বাহিনীর অভিধানেও প্রচলিত। যাদের সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের বয়সে পৌঁছানোর আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের বলা হয় "রেসপিস্তি"। পরীক্ষা জিনিসটা কি আর প্রুশিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছিল এমনি![২৭]

---

২৬ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : "রেসপিস্তি" হল একটি ইটালিয় শব্দ যার অর্থ হচ্ছে "বহিষ্কৃত"।

২৭ : প্রুশিয়া জার্মানির একটি অংশ। বলা হয়, জার্মান জাতির যুদ্ধপ্রীতি এই প্রুশিয়াবাসীদের মধ্যে থেকেই এসেছে।

● **কর প্রথা** মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা যারা বহিষ্কৃত, তাদের টাকাতেই কিন্তু এই বহিষ্কার করার দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা বেতন পান।

যে ব্যক্তি তার রোজগারের পুরো টাকাটাই খরচ করে ফেলতে বাধ্য হয় তাকেই গরিব বলে। আর যে তার রোজগারের একটা অংশমাত্র খরচ করে সেই হল ধনী। ইটালিতে, কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই, ভোগ্যপণ্যের মূল্যের প্রতিটি পয়সার উপর কর ধার্য করা আছে। আর আয়কর ব্যাপারটা তো একটা বিরাট ঠাট্টা!

আমরা শুনেছি, অর্থনীতির পাঠ্যবইতে এইরকম করপ্রথাকে বলা হয় "বেদনাহীন"। "বেদনাহীন" মানে হল ধনীরা গরিবদের দিয়ে যাবতীয় কর দিইয়ে নেবে গরিবদের অজ্ঞাতসারে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের সমস্যা নিয়ে প্রায়শই আলোচনা হয়। কিন্তু ওখানে তো কেবল ভদ্রলোকরা থাকেন। নিচু স্তরের স্কুলগুলোতে এ সব আলোচনা নিষিদ্ধ। স্কুলে রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলাটা ঠিক শোভন নয়। মালিক এ সব পছন্দ করে না।

● **কার লাভ ?** দেখা যাক, স্কুলের সময়টা যথাসম্ভব কম রাখলে লাভ কার।

বছরে সাতশ' কুড়ি ঘণ্টা মানে হচ্ছে সারা বছরের গড় হিসাবে দিনে দু'ঘণ্টা। কিন্তু একটা ছেলে দিনে আরও চোদ্দ ঘণ্টা জেগে থাকে। অবস্থাপন্ন পরিবারে এই চোদ্দ ঘণ্টা কাটে সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রচেষ্টায়।

কিন্তু একজন কৃষকের জন্য এই চোদ্দ ঘণ্টা ভরে থাকে নিঃসঙ্গতা আর মৌনতায়, যা তাদের সংকোচ আরও বাড়িয়ে তোলে। শ্রমিকের ছেলেরা এই চোদ্দ ঘণ্টা কাটায় "গোপন প্ররোচক"দের (Hidden Persuader) পাঠশালায়।[২৮]

বিশেষ করে গরমের ছুটি জিনিসটা প্রায় পুরোপুরি বড়লোকদের উপকারে লাগার জন্য তৈরি। শীতের সময় তাদের ছেলেমেয়েরা যেটুকু শিক্ষালাভ করে গরমের ছুটিতে বিদেশে বেড়াতে গিয়ে তারা তার চাইতে আরো বেশি শেখে। গরিবের ছেলেমেয়েরা গরমের ছুটির শেষে দেখে জুন মাসে তারা যেটুকু

---

২৮ : "গোপন প্ররোচক" (Hidden Persuader) : বিজ্ঞাপনকে বলে "গোপন প্ররোচক"। কারণ বিজ্ঞাপন গরিব মানুষকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে প্রয়োজনীয় মনে করতে শেখায়।

শিখেছিল তাও ভুলে গেছে।[২৯] যদি এর মধ্যে বিশেষ কোনো পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হতে হয়, তাহলে তার জন্য তৈরি হওয়ার সময় তারা কোনো গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য পায় না। তাদের সে পয়সা কোথায়? সাধারণত ওরা ও সব পরীক্ষা না দিয়ে লেখাপড়াই ছেড়ে দেয়।[৩০] আর কৃষক ঘরের ছেলেদের গরমের ছুটি কাটে ক্ষেতে-খামারে কাজ করে দিন গুজরানের জন্য টাকা রোজগার করতে।

● **সোজা কথা** জিওলিত্তি-র সময়ে কিন্তু যা বলার সোজাই বলা হ'ত: "কালটোজিরোনি-তে বিশিষ্ট ধনী লোকদের এক সভা একটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বলে যে, প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা অবলোপ করা উচিত যাতে পড়তে শেখার সময় কৃষকরা এবং খনি শ্রমিকরা নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে।"[৩১]

ফার্দিনান্দো মারতিনির কথাতেও মারপ্যাঁচ ছিল না।[৩২] সমাজের নিচু-তলার মানুষেরা ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে পড়ার সুযোগ পাওয়াতে তিনি খুব ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, "এই জন্যই তো সমাজের অভিজাত (elite) শ্রেণীর মানুষকে অধিকতর সচেষ্ট হতে হয়েছে, নতুবা সমস্ত রাজনৈতিক ও ও অর্থনৈতিক সুবিধা তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।"

● **ফ্যাসিস্ট** ফ্যাসিস্ট শাসন যখন চালু ছিল তখন আইনগুলো ছিল খোলামেলা: "শহরগুলোতে অথবা বড় গঞ্জে স্কুলগুলোতে নিম্ন ও উচ্চ দুই স্তরের প্রাথমিক বিভাগই থাকবে (মোট পাঁচ বছর)। কিন্তু ছোট ছোট গ্রামে কেবল নিম্ন প্রাথমিক স্কুল থাকবে (তিন বছর)। এটাই নিয়ম হবে।"

২৯: ইংরেজি অনুবাদকের মন্তব্য: ইটালির কিছু স্কুলে জুন মাসে ছাত্রদের পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং গরমের ছুটি শুরু হয়। তিন চার মাস এই ছুটি থাকে।

৩০: এরকম এত অজস্র ঘটনা আমরা জানি যে, পরিসংখ্যান দিতে গেলে তা ক্লান্তিকর হয়ে পড়বে।

৩১: জিওভান্নি জিওলিত্তি: ইটালিয়ান রাজনীতিবিদ। ১৮৯২ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে অনেকবার ইটালির সরকারে কাজ করেছেন।

৩২: ফার্দিনান্দো মারতিনি: ১৮৭৪ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত ইটালির শিক্ষামন্ত্রী।

পরে, সংবিধান প্রণয়ন পরিষদে ফ্যাসিস্টরাই কথা তুলেছিল যে, স্কুল ছাড়ার বয়স কমিয়ে তেরো করে দেওয়া হোক।

● **বেচারি পিয়েরিনো** কিন্তু ওরা দল জোটাতে পারেনি। কারণ এখনকার রাজনীতিবিদরা অনেক সেয়ানা। তারা জানে এখন অনেক সূক্ষ্ম-ভাবে কথা বলতে হয়।

যখন বিধানসভায় নতুন ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল নিয়ে বিতর্ক চলছিল, তখন গরিব মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল নিষিদ্ধ। তবে, "বেচারি পিয়েরিনো-র কী হবে" একথা বলে, আর ল্যাটিন ভাষা উঠে যেতে বসেছে, এ নিয়ে কান্না-কাটি করাতে কোনো বাধা ছিল না।

ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির একজন সদস্য তো দারুণ একটা মর্মস্পর্শী বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন, "সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রদের আমরা শাস্তি দেব কেন? কেন তাদের আকাশে ওড়ার পাখা আমরা ছেঁটে দেব? কেন তাদের এমন কতগুলো স্কুলে বন্দী করে রাখব যেখানে তারা অন্য সব শ্লথগতি ছাত্রদের জন্য নিজেদেরও গতিহীন করে ফেলতে বাধ্য হবে?"[৩৩]

হুজুর মালিক

● **এমন কেউ আছেন কি?** আমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, যেন আমরা বলছি যে, এমন কোনো একজন মালিক বা প্রভু আছেন যিনি আমাদের সকলকে নিয়ে পুতুল নাচ নাচাচ্ছেন। যিনি স্কুলগুলোকেও ছোট বড় করে রাখছেন।

সত্যিই এমন কেউ আছেন? কোথাও কি একটা টেবিল ঘিরে বসে একদল লোক সত্যিই কলকাঠি নাড়াচ্ছে? কেউ এসেছে ব্যাংক থেকে, কেউ ব্যবসাদার,

---

৩৩ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : ভারতের নবতম জাতীয় শিক্ষানীতি বলছে, "সবাই ভাল করেই স্বীকার করবেন যে, বিশেষ মেধা বা ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।"—মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত "জাতীয় শিক্ষানীতি : একটি উপস্থাপনা", পরিচ্ছেদ ৫, অনুচ্ছেদ ১১।

কেউ রাজনৈতিক যন্ত্রের অংশ, কেউ খবরের কাগজের লোক, সঙ্গে আছে "ফ্যাশন।" তাই কি?

আমরা জানি না। এ কথা যদি জোর করে বলি, তাহলে আমাদের বইটা কেমন যেন একটা রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ মার্কা বই হয়ে পড়বে। কিন্তু কথাটা না বললে নির্বোধের ভূমিকা নিতে হবে আমাদের। তাহলে তো বলতে হয় ছোট ছোট অনেকগুলো কলকব্জা হঠাৎ নিজে নিজে জোড়া লেগে গেল আর জন্ম নিল একটা সাঁজোয়া গাড়ি যেটা নিজে নিজেই যুদ্ধ চালাতে পারে, চালক-টালক ছাড়াই।

● **পিয়েরিনোর বাড়ি** "পিয়েরিনো"র জীবনকাহিনী হয়তো এ রহস্যের চাবিকাঠি জোগাতে পারে। চলুন, পিয়েরিনো-র পরিবারের দিকে একবার প্রেমভরে তাকানো যাক।

ডাক্তারবাবু আর তাঁর স্ত্রী মহা আনন্দেই আছেন। পড়াশুনা করেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ হয়। ছেলের সাথে খেলেন তাঁরা। ছেলে কী করছে না করছে সেদিকে তাঁদের সদাজাগ্রত দক্ষ দৃষ্টি। বাড়ি ভর্তি তাঁদের বইপত্র। সংস্কৃতির ছড়াছড়ি সেখানে। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আমি বেলচা চালাতে শিখেছি। পিয়েরিনো ওই বয়সেই শিখেছে পেন্সিল চালাতে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাট্টার সুরে তাঁরা বলেন, "আচ্ছা, ক্লাস ওয়ানে কেন, ওকে একেবারে ক্লাস টু-তে ভর্তি করলেই তো হয়।" ব্যাপারটা যেন একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। নিশ্চিন্তে তাঁরা ওকে পরীক্ষায় বসিয়ে দেন। ফেল যদি করেও, কী আসবে যাবে তাতে!

কিন্তু ফেল ও করে না। নম্বর পায় অনেক। গোটা পরিবারে খুশির মেজাজ আসে। আমি পাশ করলে আমার বাড়িতেও সবাই খুশি হত।

● **তেলা মাথায় তেল** সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, এই তরুণ দম্পতি কিন্তু একটা আইনের সাহায্য পেয়ে যান। আইনটা একদম তাঁদেরই জন্য তৈরি। আইনে বলে, পাঁচ বছরের শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না, কিন্তু ছ'বছরের শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে স্বচ্ছন্দে।

আইনটা কি কোনো মূর্খের সৃষ্টি? নাকি, কোনো পাকা মাথা ভেবে-চিন্তেই বানিয়েছে আইনটা?

আমাদের তরুণ দম্পতি অবশ্যই আইনটা রচনা করেননি। ওঁরা আইনটার

কথা জানতেনও না। কিন্তু তাহলে কে এই আইনের প্রণেতা?

● **একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা?** এইভাবে শুরু হয়ে চলতেই থাকে, বছরের পর বছর। পিয়েরিনো-র এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে ওঠা আটকায় না কখনো। পড়াশুনাও খুব একটা বিশেষ করতে হয় না ওকে।

এদিকে আমি দাঁতে দাঁত চেপে পড়াশুনা করে যাই। তবুও ফেল করি। পিয়েরিনো-র সময়ের কোনো অভাব হয় না। খেলাধুলা চলে দিব্যি। নানা জাতের রাজনৈতিক সভাতে তার হাজিরা দিতে সময় থাকে প্রচুর—কোনো সভা দক্ষিণপন্থীদের, কোনোটা বামপন্থীদের, কোনোটা বা ফ্যাসিবাদীদের। এরই মধ্যে বয়ঃসন্ধির বিশেষ সংকট নিয়ে সে চিন্তিত হয়, বছরখানেক সে নিঃসঙ্গতা-টঙ্গতা নিয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়। মাঝে এক বছর সে বিদ্রোহ বিদ্রোহ খেলাও চালায়।

বারো বছর বয়সে আমি যতটা সাবালক ছিলাম পিয়েরিনো আঠারো বছরেও তা হয়নি। কিন্তু ওর এগিয়ে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারে না। পুরো সম্মান নিয়ে ও গ্র্যাজুয়েট হবে। গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হয়ে বিনা বেতনেই ও নানা কাজ করবে।

● **বিনা বেতনে কাজ** হ্যাঁ, বিনা বেতনে। বিশ্বাস করতে পারেন? গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা কাজ করে মাইনে নেয় না।

এবারে আর একটা অদ্ভুত আইন দেখুন। আইনশাস্ত্রে এর অনেক মহান নজির আছে। কার্লো অ্যালবার্তির[৩৪] আইনবিধিতে বলে দেওয়া আছে, "কোনো সংসদ সদস্য অথবা মন্ত্রীর কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া অপ্রয়োজনীয়।"

এ কিন্তু স্থূল স্বার্থচিন্তা সম্পর্কে কোনো রোমান্টিক অনীহাপ্রসূত ব্যাপার নয়। সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষদের সরিয়ে রাখার জন্য এ একটি অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। মুখের উপর কিছু না বলে অবশ্য।

শ্রেণীসংগ্রাম যখন ভদ্রলোকেরা চালান তখন সেটা বেশ সভ্য ব্যাপার। তখন তাতে কেউ বিচলিত হন না। না ধর্মযাজকরা, না "এস্‌প্রেস্‌সো"-র পাঠক বুদ্ধিজীবীরা।[৩৫]

---

৩৪ : কার্লো অ্যালবার্তি : ১৮৮৪ পর্যন্ত পীডমন্ট, লাইগুরিয়া এবং সার্ডিনিয়ার রাজা।

৩৫ : ইংরেজি অনুবাদকের টীকা : "এস্‌প্রেস্‌সো" : বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। মধ্যপন্থীদের মধ্যে যাঁরা বাম-ঘেঁষা তাঁদের কাগজ।

● **পিয়েরিনো-র মা** তারপরে একদিন পিয়েরিনো একজন অধ্যাপক হবে। ঠিক নিজের মতো একজন বৌ খুঁজে বার করবে। তাদের ছেলে হবে আরেক পিয়েরিনো। আরও চমৎকার পিয়েরিনো।

বছরে তিরিশ হাজার এমন গল্প শুনতে পাবেন।

পিয়েরিনো-র মায়ের কথা ভাবা যাক। হিংস্র জন্তু নন তিনি। কেবল একটু স্বার্থপর। তিনি কেবল দুনিয়ার অন্য সব ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকতে চান। অবশ্য পিয়েরিনোকে অন্য পিয়েরিনোদের সাথে মিশতে দিতে কোনো আপত্তি নেই তাঁর। তিনি আর তাঁর স্বামী বুদ্ধিজীবী-পরিবৃত হয়ে বাস করেন। স্পষ্ট কথা হল, তাঁরা একটুও বদলাতে চান না।

আর পিয়েরিনোর স্কুলে অন্য সহপাঠীদের মায়েরা? হয় তাঁদের সময় নেই, অথবা অন্য কোনো রাস্তা তাঁদের অজানা। তাঁদের রোজগার এত কম যে কেবল খাওয়া-পরা জোটাবার জন্যই তাঁদের ছেলেবেলা থেকে বুড়ো বয়স পর্যন্ত, ভোরবেলা থেকে রাত অবধি খেটে যেতে হয়।

কিন্তু পিয়েরিনোর মা চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন। তাছাড়া, বাড়িতে পিয়েরিনোর সহপাঠীদের মায়েদের কেউ না কেউ তাঁকে সাহায্য করেন। কোনো জিয়ানীর মা, তাঁর নিজের ছেলেকে অবহেলা করতে বাধ্য হন পিয়েরিনোর মায়ের গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করতে গিয়ে।

পিয়েরিনোর মায়ের হাতে অনেক সময়। তাঁর নিজস্ব উৎসাহের কাজগুলো করার জন্য। সময়টা এলো কোত্থেকে? গরিবরা উপহার দিয়েছে, নাকি সময়টা চুরি করেছে বড়লোকেরা? তিনি তাঁর সময়টা—কই, ভাগ তো করে নেন না!

● **সিংহভাগ** আসলে পিয়েরিনোর মা হিংস্র জন্তু নন, কিন্তু ধোয়া তুলসী-পাতাও নন তিনি। এইরকম ছোট ছোট ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা যদি আমরা একত্র করি, তাহলে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয় একটা গোটা শ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থপরতা, নিজের জন্য সিংহভাগ কেড়ে নেবার প্রবণতা।

এই শ্রেণী মানুষের উপরে ফ্যাসিবাদ, জাতি বিদ্বেষ, যুদ্ধ, বেকার সমস্যা এসব কিছু লেলিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। সাম্যবাদকে গ্রহণ করতেও এদের কোনো অসুবিধা নেই, কেন না এরা বিশ্বাস করে—"কিছুই যাতে না পাল্টায় সেই জন্য সবকিছু পাল্টানো দরকার।"[৩৬]

---

৩৬ : "দ্য লেপার্ড" নামক উপন্যাসে কথাটা আছে। বলছেন সিসিলির এক বড় জমিদার ১৮৬০ সালে গ্যারিবল্ডি আন্দোলনের সময়। পরে উনি নিজেই গ্যারিবল্ডির দলে যোগ দেন। ফলে ওঁর ধনসম্পত্তি অথবা ক্ষমতা কোনোটাই আর হাতছাড়া হয় না।

ঠিক কোন কায়দায় আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তা জানা নেই। কিন্তু যখন সব ক'টা আইন দেখি পিয়েরিনোর সুবিধার জন্য আর আমাদের বাঁশ দেবার জন্য তৈরি, তখন এ নিছক কাকতালীয় ঘটনা—একথা বিশ্বাস করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

বাছাই করার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে

● **বিশ্ববিদ্যালয়ে** বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার ৮৬'৫ শতাংশ হচ্ছে "আদরের দুলাল"। ১৩'৫ শতাংশ আসে খেটে খাওয়া মানুষের ঘর থেকে। এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ডিগ্রিটা যারা পায় তাদের ৯১'৯ শতাংশ হল তরুণ বাবু-র দল। আর ৮'১ শতাংশ শ্রমিকের ঘরের ছেলে।[৩৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ে সব গরিবের ছেলেরা যদি দল বাঁধতে পারত, তাহলে একটা কাজের কাজ হ'ত। কিন্তু না। তার বদলে বড়লোকরা এদের ভাই-বেরাদর করে নেয় আর, সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এদের পুরস্কার জুটিয়ে দেয়। ফল কী হয়? ১০০ ভাগই পরিণত হয় "আদরের দুলাল"-এ।

● **রাজনৈতিক দলগুলিতে** বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের কর্তা-ব্যক্তিরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।

এ ব্যাপারে সর্বহারাদের রাজনৈতিক দলগুলিও একই পথের পথিক। "আদরের দুলাল"-দের দেখে শ্রমিকদের দলগুলি নাক সিঁটকায় না। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি যতক্ষণ তাঁদের জন্য বাঁধা আছে ততক্ষণ "আদরের দুলাল"-রাও নাক সিঁটকায় না শ্রমিকদের দলগুলি দেখে।

বস্তুত "গরিবদের সাথে" কাজ করাটা এখন বড়লোকদের মধ্যে বেশ একটা ফ্যাশন। "গরিবদের সাথে" কাজ করা মানে অবশ্যই গরিবদের নেতৃত্ব দেওয়া।[৩৮]

---

৩৭ : ১৯৬৩ সালের পরিসংখ্যান। পরের বছরগুলির হিসাবই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৩৮ : বর্তমানে সবচেয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা একটি ক্ষুদ্র দলের সদস্য, যে দলটির কোনোই গণসমর্থন নেই (সামাজিক সর্বহারা, বা "চিনা")। ১৯৬৬-র সেপ্টেম্বরে ফ্লোরেন্সে একটি "চিনা" বিক্ষোভ সংগঠিত করে ছাত্ররা, যারা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের ছেলে।

● **ভোট প্রার্থীরা** সব দলগুলি এক একটা প্রার্থী তালিকা তৈরি করে। কয়েকটা শ্রমিকের নাম তাতে থাকে ঠিকই। তবে সে কেবল বাইরের চটক বজায় রাখতে আর চক্ষুলজ্জা ঢাকতে। ভেতরে ভেতরে ব্যবস্থা থাকে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরাই অগ্রাধিকার পায়। বলা হয়ঃ "যারা ব্যাপারগুলো জানে বোঝে তাদের হাতে ছেড়ে দাও। বিধানসভায় গিয়ে একজন শ্রমিকের তো ধন্দ, লেগে যাবে। তাছাড়া, অধ্যাপক 'ক' তো আমাদের লোক।"

● **বিধানসভা** মোট কথা, নির্বাচিত করে নতুন আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় যাদের তারা সকলেই পুরানো আইনগুলো নিয়ে যথেষ্ট খুশি। যে সব অবস্থা এখুনি পাল্টানো দরকার সেইসব অবস্থার মুখোমুখি এরা কেউ ব্যক্তিগত জীবনে কখনো হননি। এরাই হচ্ছে একমাত্র লোক যাদের রাজনীতিতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়।

লোকসভার ৭৭ শতাংশ সদস্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। এরা নাকি ভোটারদের প্রতিনিধি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ভোটার সংখ্যা সমগ্র জনগণের ১·৮ শতাংশ মাত্র। লোকসভায় শ্রমিক ও ইউনিয়ন সদস্যদের সংখ্যা হল ৮·৪ শতাংশ মাত্র। অথচ ভোটারদের মোট সংখ্যার ৫১·১ শতাংশ কিন্তু এরাই। লোকসভায় কৃষক সংখ্যা মাত্র ০·১ শতাংশ। অথচ ভোটারদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যা হল ২৮·৮ শতাংশ।[৩৯]

● **ব্ল্যাক পাওয়ার** স্টোকলি কারমাইকেল সাতাশ বার জেলে গেছেন।[৪০] তাঁর শেষবারের বিচারের দিন তিনি ঘোষণা করেন, "একজন শ্বেতাঙ্গকেও আমি বিশ্বাস করি না।"

একজন তরুণ শ্বেতাঙ্গ, সারা জীবন কালো মানুষদের অধিকারের লড়াই-এ সহযোদ্ধা, প্রশ্ন করেছিলেন, "একজনকেও বিশ্বাস করো না, স্টোকলি?" দর্শকদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কারমাইকেল কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, "না, একজনকেও না।"

যদি ওই তরুণ কারমাইকেলের কথায় অপমানিত বোধ করেন, তাহলে

৩৯ঃ ১৯৬৫-৬৬ সালের পরিসংখ্যান তথ্য অনুসারে।

৪০ঃ আমেরিকায় কালো মানুষদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার সংগ্রাম হল "ব্ল্যাক পাওয়ার" বা "কৃষ্ণাঙ্গ ক্ষমতা" আন্দোলন। কৃষ্ণাঙ্গরা আমেরিকার জীবনে সমান অধিকার চেয়ে চেয়ে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে ক্ষমতার দাবি তুলেছে। স্টোকলি কারমাইকেল এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

কারমাইকেল ঠিকই বলেছেন। আর তরুণ শ্বেতাঙ্গটি যদি সত্যিই কালো মানুষদের পক্ষে হন, তাহলে কথাটা তাকে হজম করতে হবে, একটু সরে আসতে হবে এবং একইভাবে ভালোবেসে যেতে হবে কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের। হয়তো কারমাইকেল ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন।

মধ্যপন্থী আর বামপন্থী খবরের কাগজগুলো বরাবরই বারবিয়ানা বিদ্যালয় প্রকাশিত সব রচনার প্রশংসা করেছে। এই বইটা পড়ার পর, ওরা হয়তো দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে জুটে আমাদের ঘেন্না করতে শুরু করবে। তখন পরিষ্কার দেখা যাবে সব রাজনৈতিক দলের চাইতে বড় দল হল ইটালির কলেজ গ্র্যাজুয়েট পার্টি—"পার্তিতো ইতালিয়ানো লরিয়াতি।"

কার জন্য পড়াচ্ছেন

● **সদিচ্ছা** শিক্ষকদের সদিচ্ছার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

আপনারা শিক্ষকরা মাইনে পান সরকারের কাছ থেকে। ছেলেমেয়েদের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে আপনার। আপনি ইতিহাস পড়েছেন। আপনি ইতিহাস পড়ান ছাত্রদের। আপনার অন্তত সবকিছু পরিষ্কার বোঝা উচিত।

অবশ্য, আপনি তো কেবল বাছাই করা ছেলেমেয়েদের দেখেন। আপনার সংস্কৃতির ধারণাও এসেছে কেবল বই পড়ে। বইগুলোও তো লিখেছে কর্তাব্যক্তিদের লোকজনরাই। ওরা ছাড়া লিখতে তো পারেও না কেউ। কিন্তু আপনার তো সব কিছু খুঁটিয়ে পড়া, তলিয়ে দেখা উচিত। তাহলে কী করে আপনি সদিচ্ছার কথা বলেন?

● **নাৎসী** আমি আপনাকে বোঝার চেষ্টা করেছি অনেক। আপনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। দুষ্কৃতকারী বলে ভুল করবে না কেউ আপনাকে। তবে, নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের সাথে এক ফোঁটা মিল আছে আপনার। ওই যে, সেই অতিশয় সৎ, অনুগত নাগরিক, যে সাবানের পেটি গুণে রাখত। গুণতিতে কখনো ভুল হ'ত না তার। কিন্তু সাবানগুলো যে মানুষের চর্বি দিয়ে বানানো সে কথা জিজ্ঞেস করেনি সে কোনোদিনও।

● **আমার চেয়েও ভীরু আপনি** কার জন্য করছেন এ কাজ? স্কুল-গুলোকে বাচ্চাদের কাছে বিরাগভাজন করে তুলে, জিয়ানীদের রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে আপনার কি লাভ হচ্ছে?

আমি দেখিয়ে দিতে পারি আপনি আমার চাইতে বেশি ভীরু কী ভাবে। আপনি পিয়েরিনোর বাবা-মাকে ভয় পান? অথবা, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত সহকর্মীদের ডরান আপনি? অথবা, শিক্ষা অধিকর্তাকে?

আপনি যদি আপনার কর্মজীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত চিন্তিত থাকেন তাহলে একটা উপায় বাতলাতে পারি। পরীক্ষার সময় ডেস্কগুলোর সারির মধ্যে পায়চারি করে পাহারা দেন তো? উত্তর লেখার সময় ছাত্রদের কিছু ভুল শুধরে দিয়ে একটু চোট্টামি করে নিন।

● **স্কুলের সুনাম** অথবা হয়তো আপনার ভয় এত সহজ বা স্পষ্ট কোনো কিছু নিয়ে নয়। হয়তো আপনি ভয় পান আপনার বিবেককে। তাহলে বলব, আপনার বিবেকটা বড় বিচিত্র ধাতুতে গড়া।

এক প্রিন্সিপাল একটি ছাত্রের প্রগতিপত্রে লিখলেন, "আমি মনে করি এই ছাত্রটিকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করলে স্কুলের সুনাম নষ্ট হবে।" কিন্তু স্কুলটা কে? স্কুল তো আমরাই। স্কুলের সেবা করতে হলে আমাদের সেবাই করতে হবে।

● **ছাত্রটির ভালর জন্য** "যতই হোক, যা করা হচ্ছে ছাত্রটির ভালর জন্যই করা হচ্ছে। আমাদের ভুললে চলবে না যে এই ছাত্ররা ক'দিন পরেই হাইস্কুলে পড়তে যাবে।" ছোট একটা গ্রাম্য স্কুলের হেডমাষ্টার বাগাড়ম্বর সহকারে বলেছিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু দেখা গেল ক্লাসের তিরিশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে কেবল তিনজন হাইস্কুলে পড়তে যেতে পারবে। শিক্ষক ভদ্রলোকের মেয়ে আনা, বেনের দোকানের মালিকের মেয়ে মারিয়া, আর পিয়েরিনো তো আছেই। আর ধরুন যদি আরও অনেক ছেলেমেয়ে যেতও, তাতেই বা কী হ'ত?

এই হেডমাষ্টার তাঁর গ্রামাফোনের রেকর্ড পাল্টাতে ভুলে গেছেন। স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা কতটা বেড়েছে তিনি খেয়ালই করেননি। প্রথম শ্রেণীবর্ষেই এখন ৬,৮০,০০০ ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়। তারা বেশির ভাগই গরিব ঘরের সন্তান। বড়লোকরা সংখ্যায় নগণ্য।

উনি বলেন ওঁর স্কুল নাকি শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে। ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। ওঁর স্কুল একটি মাত্র শ্রেণীর জন্য চলে। সামনে এগোবার জন্য দরকার আর্থিক জোর যার আছে এ স্কুল কেবল তার।

● **ন্যায়বিচার** ভারি মিষ্টি এক দিদিমণি বললেন, "বাজে ছাত্রকে পাশ

করালে ভাল ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হয়।"

তার চাইতে পিয়েরিনোকে এক পাশে ডেকে নিন, আঙুরক্ষেতের কর্মীদের প্রসঙ্গে বাইবেলে যেমন আছে[৪১] তেমনি বলুন, "তোমাকে পাশ করাচ্ছি, তুমি পড়া তৈরি করেছ বলে। তোমার উপরে দু'ভাবে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে: তুমি পাশ করেছ, আবার তুমি পড়াও তৈরি করেছ। জিয়ানীকে আমি পাশ করিয়ে দিচ্ছি ওকে উৎসাহ দেবার জন্য, কিন্তু ও বেচারি এখনও পড়া শিখতে পারেনি।"

● **সমাজের জন্য** আরেকজন শিক্ষক আবার তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন। "যে বাজে ছাত্রটিকে আজ আমি উঁচু ক্লাসে তুলে দেব, সে যদি কাল এই করে করে ডাক্তার হয়ে বসে?"

● **সাম্য** কর্মজীবন, সংস্কৃতি, পরিবার, স্কুলের সুনাম: ক্ষুদে ক্ষুদে এই সব দাঁড়িপাল্লায় আপনারা ছাত্রদের শিক্ষার মান মাপছেন। ভীষণ খেলো এই মান-নিরূপক যন্ত্রগুলো। একজন শিক্ষকের জীবনকে এই সব ক্ষুদ্রতা দিয়ে ভরে রাখবেন?

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আসল কথা বুঝেছেন। কিন্তু কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আর ভীতি জিনিসটা তো সর্বব্যাপী। কিন্তু আপনার

৪১: ম্যাথুলিখিত সুসমাচার, নিউ টেস্টামেন্ট, বাইবেল: একটি আঙুর ক্ষেতের মালিক কর্মীর খোঁজে বেরিয়ে সকালে, দুপুরে, বিকেলে অনেক লোককে ক্ষেতে কাজে লাগালেন। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে কাজে যোগ দিল। চুক্তি হল কাজের পারিশ্রমিক হবে এক পেনি মাথাপিছু। দিনের শেষে সকলকেই মালিক এক পেনি করে দিলেন। যে সকালে কাজে লেগেছিল তাকেও, যে সন্ধ্যের আগে লেগেছিল তাকেও। যারা সকালে কাজে লেগেছিল তারা বিরক্ত হল। তারা চাইল বেশি পারিশ্রমিক। তারা বলতে লাগল, "এরা মাত্র একঘন্টা কাজ করেছে, আপনি ওদের আমাদের সমতুল্য করে দিলেন? আমরা যারা সারা দিনের ভার বয়েছি, উত্তাপ সয়েছি?" ক্ষেতের মালিক উত্তর দিলেন, "বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি কি আমার সাথে চুক্তি করনি এক পেনি নেবে বলে? যা তোমার প্রাপ্য তা তুমি নাও, এবং নিজের পথে যাত্রা কর। তোমাকে যা দিয়েছি এই সবশেষে আসা ব্যক্তিটিকেও আমি তাই দেব।" (পরিচ্ছেদ ২০, পংক্তি ১২, ১৩, ১৪)।

সামনে অন্য কোনো রাস্তা খোলা আছে কি? আজকের দুনিয়ায় কোনো মানুষের জীবন রাজনীতি বাদ দিয়ে পূর্ণতা পেতে পারে না।

আফ্রিকায়, এশিয়াতে, ল্যাটিন আমেরিকায়, দক্ষিণ ইটালিতে, পার্বত্য এলাকায়, চষাক্ষেতে, শহরে শহরে, কোটি কোটি শিশু অপেক্ষা করে আছে। সমান অধিকার চায় তারা। শিক্ষার সুযোগ চায়। আমারই মতো তারা সংকুচিত। সান্দ্রোর মতোই নির্বোধ, জিয়ানীর মতোই অলস। হীরের টুকরো ছেলেমেয়ে এরা।

আমরা যে সব সংস্কার চাই

১। ছাত্রদের ফেল করাবেন না।
২। যে সব ছেলেমেয়েদের নির্বোধ মনে হয় তাদের জন্য সর্বাত্মক (full time) স্কুল চালু করুন।
৩। অলসদের একটা লক্ষে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করুন।

ফেল করাবেন না

● **লেদ মেশিনের শ্রমিক** যে শ্রমিকটি লেদ মেশিন চালায় সে কি শুধু সঠিকভাবে তৈরি যন্ত্রাংশগুলি জমা দেয়? তাহলে ভাল খারাপ সব ক'টা যাতে ঠিক মতো তৈরি হয় সেদিকে সে নজরই দেবে না।

কিন্তু আপনি? যে ক'টা যন্ত্রাংশ আপনার অপছন্দ সে ক'টা যে কোনো সময়ে আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন। কাজেই আপনি দেখাশোনা করে সন্তুষ্ট থাকেন কেবল সেইসব ছাত্রদের যাদের সাফল্য আসে স্কুল-নিরপেক্ষ কারণে।

● **আট বছর স্কুল চাই** সংবিধানের ৩৪ নং ধারা সকলকে অধিকার দিয়েছে আট বছর স্কুলে পড়ার। আট বছর মানে কিন্তু আটটা আলাদা নতুন নতুন ক্লাস। প্রতি ক্লাসে দু'বার করে থেকে আট বছরে চারটে ক্লাসে পড়তে বাধ্য করা কিন্তু বেআইনি কাজ এখন। নতুবা, ৩৪ নং ধারাটি নিছক

গালভরা কথায় পর্যবসিত হয়। সংবিধান প্রণয়নকারী পরিষদের পক্ষে সেটা হয়ে দাঁড়ায় অপমানজনক।

আজকে ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে পড়া শেষ করাটা কিন্তু বিলাসের ব্যাপার নয়। এ হল প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম সাংস্কৃতিক অধিকার।

এ অধিকার যে পাবে না, তাকে সকলের সমান বললে মিথ্যা বলা হবে।

● **ব্যুৎপত্তি** পরীক্ষা করে দেখার জাতিবিদ্বেষী তত্ত্বের আড়ালে আর লুকিয়ে থাকতে পারবেন না।

ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো এবং সব বিষয়ে পাশ করে যাওয়ার মতো ব্যুৎপত্তি সব ছেলেমেয়েরই আছে।

"এ বিষয়টি তোমার জন্য নয়"— এ কথাটা কোনো ছেলেকে বলে দেওয়া সোজা। ছেলেটি কথাটা মেনেও নেবে। সেও তার শিক্ষকের মতোই অলস। কিন্তু সে ঠিকই বুঝবে, তার শিক্ষক তাকে নিজের সমান বলে মনে করেন না।

"এ বিষয়টি ঠিক তোমারই উপযুক্ত"— আরেকটি ছেলেকে এ কথা বলা কিন্তু আদৌ উচিত নয়। যদি দেখা যায় কোনো ছাত্র একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত বেশি আগ্রহী, তাহলে তাকে ওই বিষয় একদম পড়তে না দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তাকে বলতে হবে "একটেরে"। পরবর্তী জীবনে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে দরজায় খিল দেবার সময় জুটবে অনেক।

● **টুকরো কাজ** এমন যদি হ'ত যে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে প্রতিটি বিষয়ে যেমন করে হোক এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনি বাধ্য, তাহলে বুদ্ধি খাটিয়ে যেমন করে হোক আপনি চেষ্টা করতেন যাতে প্রত্যেকে ঠিকমতো কাজ করে।

আমার ক্ষমতা থাকলে আমি আপনাকে মাইনে দিতাম টুকরো টুকরো কাজের হিসাব ধরে। একজন ছাত্র এই বিষয়টা শিখেছে, সেইজন্য আপনার পাওনা হয়েছে এত। কিংবা আরও ভাল হ'ত যদি আপনাকে জরিমানা দিতে বাধ্য করতে পারতাম। যে ক'জন ছাত্র কোনো একটা বিষয় শিখছে না তাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু জরিমানা।

তখন দেখতেন, আপনার চোখ সবসময় থাকত জিয়ানীর দিকে। ওর অমনোযোগী দৃষ্টিতে তখন আপনি বুদ্ধি খুঁজে বার করতেন। যে বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রদত্ত। সব ছেলেমেয়েদেরই ঈশ্বর বুদ্ধি দিয়েছেন। যে ছেলেটির খুব প্রয়োজন আপনাকে, তার জন্য লড়ে যেতেন। চটপটে মেধাবী ছেলেটির দিকে অতটা আর তাকাতেন না। পরিবারে নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে লোকে

তাই করে। ওর কথা ভেবে রাতে আপনার ঘুম হ'ত না তাহলে। সবসময় ভাবতেন কী করে ওর উপযোগী নতুন উপায় বার করা যায় ওকে শিক্ষাদানের। কোনোদিন ও ক্লাসে না এলে আপনি দৌড়তেন ওর বাড়িতে, ওকে নিয়ে আসার জন্য।

আপনি নিজে একদম শান্তিতে থাকতে পারতেন না তাহলে। কারণ যে স্কুল জিয়ানীদের পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য করে, সে স্কুল আদপেই স্কুল পদবাচ্য নয়।

● **আপনারাই আসলে মধ্যযুগীয়** কেউ খুব বাড়াবাড়ি করলে আমাদের স্কুলে আমরা বেতও ব্যবহার করেছি।

দেখুন, ওসব পিটপিটানি ছাড়ুন। ওসব শিক্ষাতত্ত্ব-টত্ত্ব বাদ দিন। বেত লাগলে বলুন, এনে দেব। কিন্তু আপনারা নম্বর লেখার খাতার উপরে যে কলমটা রেখেছেন, ওটা ফেলে দিন। বেতের দাগ মিলিয়ে যেতে একদিনের বেশি লাগে না কিন্তু ওই কলমের দাগ সারা বছর লেগে থাকে। মেলায় না।

আপনার ওই সুন্দর "আধুনিক" কলমটির চোটে সারা জীবনে জিয়ানী একটা বইও পড়তে পারবে না। একটা ভদ্রগোছের চিঠি লিখতে পারবে না। এর চাইতে কড়া শাস্তি কিছু আছে? এ তো মারাত্মক শাস্তি!

● **অঙ্ক** একমাত্র অঙ্কের মাস্টারমশাই কোনো ছাত্রকে ফেল করাতে না পারলে সত্যিই অভিযোগ করতে পারেন। যে ছাত্রটি প্রথম বছরের অঙ্ক শিখতে পারেনি, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরের অঙ্ক সে কখনোই করতে পারবে না।

কিন্তু অঙ্ক তো অনেক বিষয়ের মধ্যে একটা। সপ্তাহে মাত্র তিন ঘণ্টা অঙ্ক শিখতে হয়। এই তিন ঘণ্টার পড়া শিখতে পারে না বলে তাকে বাকি তেইশ ঘণ্টা অন্য বিষয়গুলো শেখা থেকে বঞ্চিত করা হবে কেন? ওই বিষয়গুলো তো সে ভাল করে শিখতে পারে।

● **কম হলে ক্ষতি কী** ল্যাটিন শিক্ষা প্রসঙ্গে বিধানসভাতে বিতর্ক হয়েছিল। এখানে অঙ্ক শেখা নিয়ে সেরকম একটা আলোচনা হতে পারে।

বাড়িতে আর কর্মস্থলে তার আশু প্রয়োজন মেটাতে কতটা অঙ্কের জ্ঞান দরকার হয় একজন লোকের? খবরের কাগজ পড়তে অঙ্ক লাগে কি? বস্তুত একজন সাধারণ সংস্কৃতিবান মানুষ স্কুলে শেখা অঙ্কের কতটুকুই বা মনে রাখেন?

আট বছরের শিক্ষাক্রমে সাদামাটা যেটুকু গণিত শেখানো হয় সেটুকু। তার মধ্যে আবার বীজগণিত আর গাণিতিক রাশিমালাগুলি (**numerical expressions**)[৪২] মনে রাখা যায় না।

তাছাড়া, আমাদের ভাষার মধ্যে "বীজগণিত" শব্দটাকে অর্থবহ করে তুলতে পারার সমস্যা তো আছেই। কিন্তু এ তো সারা বছরে একটা মাত্র পাঠের দ্বারাই শিখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সর্বাত্মক (full time) শিক্ষণ।

● **পুনরাবৃত্তি** আপনি ভাল করেই জানেন পুরো পাঠক্রম শেষ করতে হলে ছাত্রদের এক একটা বিষয়ে সপ্তাহে দু'ঘণ্টা করে পড়ানো যথেষ্ট নয়।

এই সমস্যার যে সমাধান এখনো পর্যন্ত সামনে রয়েছে তা কেবল সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলির উপযোগী। গরীবদের তো সারা বছর খেটেই যেতে হয়। পেটি বুর্জোয়াদের আপনি দিচ্ছেন "কোচিং" —স্কুলের পরে, বাড়তি টাকার বিনিময়ে — পাঠগুলো ঝালিয়ে নেবার জন্য। বড়লোকের ছেলেদের জন্য ব্যবস্থা ভালই, জানা জিনিস আবার শিখছে তারা। পিয়েরিনোকে সবই ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়িতে।

অথচ "ডোপোস্কুওলা" জিনিসটা অনেক ভাল সমাধান। ছেলেরা স্কুলে যা শিখল, ছুটির পরে বিনা খরচে তা আরেকবার ঝালিয়ে নিতে পারবে, সঙ্গে পাবে আপনার সাহায্য।

● **শ্রেণীহীন স্কুল** মুখোশ খুলে ফেলাই ভাল। যতদিন পর্যন্ত আপনাদের গরিব-তাড়ানো শ্রেণীভিত্তিক স্কুল নামক প্রহসনের ইতি টানা না যাচ্ছে ততদিন "ডোপোস্কুওলা" চালাতেই হবে, যা বড়লোকদের তফাতে রাখবে।

অনেকে আমাদের প্রস্তাবিত এই সমাধানসূত্রের কথা শুনে ক্ষেপে যাবেন। কিন্তু অজস্র ছেলে ফেল করছে আর বড়লোকের বাড়িতে ভিড় জমছে গৃহ-

৪২ : গাণিতিক রাশিমালা : ইন্টারমিডিয়েট স্কুলে শেখানো অত্যন্ত জটিল কিছু হিসাব। এ সব হিসাব কোনো ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের কাজে প্রয়োগ করা হয় না।

শিক্ষকদের — কই, এ দেখে তাঁরা তো চটেন না! একে সততা বলি কী করে?

জন্ম থেকে কী পিয়েরিনোর জাত আলাদা? তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র হয়ে গেছে তার বাড়ির পরিবেশের জন্য, স্কুলের পরে বাড়িতে। তেমন পরিবেশ পেলে সব ছেলেমেয়েই পিয়েরিনোর মতো সহজে সব শিখতে পারে। সেই পরিবেশ এনে দিতে হবে "ডোপোস্কুওলা"-র মাধ্যমে। অবশ্য ওই ছেলেমেয়েদের নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করা চলবে না।

● **পারিপার্শ্বিক** "সর্বাত্মক" (**full time**) কথাটা শুনে ঘাবড়ে যান আপনারা। ভাবেন, এখন যা চলছে, অর্থাৎ এই ক'ঘণ্টা বাচ্চাগুলোকে সামলানোই যথেষ্ট কণ্টকর। কিন্তু সত্যি সত্যিই চব্বিশ ঘণ্টার স্কুল চালানোর চেষ্টাও তো কখনো করেননি।

এখন ক্লাস নেবার সময় আপনার মাথায় কেবল ঘোরে, কখন ঘণ্টা পড়বে। জুন মাসের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করা যাবে কিনা তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তার অবধি থাকে না। অথচ মনকে প্রসারিত করার কাজে আপনি ব্যর্থ, আপনার তরুণ ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা আপনি মেটাতে পারেন না, কোনো বিতর্কে যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতিতে পৌঁছাবার ক্ষমতা নেই আপনার।

ফলে কী হয়? কোনো কিছুই ঠিকমতো করে উঠতে পারেন না আপনি। সবসময় আপনার মন ভরে থাকে হতাশার গ্লানিতে। শিশুরাও সেই হতাশারই শিকার হয়। আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন কাজের চাপে নয়, অকৃতকার্যতার এই বোঝা বয়ে বয়ে।

● **বিশ্বাস করতে হবে,** "ডোপোস্কুওলা" নিয়মিত চালু রাখুন প্রাথমিক বছরগুলোতে। প্রত্যেকদিন। রবিবারে, বড়দিনে, ইস্টারে, সারা গরমের ছুটিতে। প্রচলন না করেই কী করে বলেন যে ছাত্ররা আর তাদের অভিভাবকরা "ডোপোস্কুওলা" চান না?

অভিভাবকদের কাছে একটা পুরানো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া কপি পাঠিয়ে কোনো প্রিন্সিপাল যদি বলেন তিনি "ডোপোস্কুওলা" চালু করার চেষ্টা করেছেন, তাহলে বলব তিনি বাজে কথা বলছেন। যখন কোনো নতুন দ্রব্য বাজারে ছাড়া হয়, তখন সেটা চালাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়। "ডোপোস্কুওলা"-র ব্যবস্থা সফল করতে হলে তার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস রাখা হল প্রথম কাজ।

সর্বাত্মক কাজ ও পরিবার

● **চিরকৌমার্য** সর্বাত্মক স্কুল চালু করতে গেলে ধরে নিতে হবে শিক্ষকের পারিবারিক দায়িত্ব সেখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সবচেয়ে ভাল হ'ত যদি একটা সর্বাত্মক স্কুল চালাতেন শিক্ষক, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে, নিজেদের বাড়িতে। যদি স্কুলটা হ'ত সর্বস্তরের মানুষের জন্য অবারিত দ্বার, কোনো রুটিনে বাঁধা নয়।

গান্ধী করেছিলেন ঠিক এমনটি। নিজের ছেলেদের মিশতে দিয়েছিলেন অন্যদের সাথে। তারা তাঁর নিজের থেকে অন্যরকম হয়ে যাবে জেনেও। আপনি পারবেন?

এ সমস্যা সমাধানের আরেকটা উপায় হল শিক্ষকের চিরকুমার থাকা।

● **বৈবাহিক সমস্যা** "চিরকৌমার্য" কথাটা আজকের দিনে অচল।

আমাদের ধর্মব্যবস্থা কথাটা অনুধাবন করতে পেরেছিল ঈশ্বরপুত্র যীশুর তিরোধানের এক হাজার বছর পরে। পাদ্রিদের জন্য।

গান্ধী বুঝেছিলেন, তাঁর স্কুলের স্বার্থে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। বাইশ বছর বিবাহিত জীবনের পরে। তেরো বছর বয়সে বাবা-মা ব্যবস্থা করে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার ভারতীয় সামাজিক নিয়ম মেনে।

একজন চিনা শ্রমিক নিজেকে স্বেচ্ছায় পুরুষত্বহীন করেছিলেন। মাও তাঁকে তাঁর কমরেডদের সামনে একটা প্রশংসনীয় উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেছিলেন (আমাদের ইটালিয়ান "চিনা"রা এ কথা উল্লেখ করতে লজ্জা পায়।)

● ৮৮,০০০ চিরকৌমার্য মেনে নিতে আপনাদের আরও হাজার বছর লাগবে। কিন্তু ততদিন একটা কাজ তো আপনারা করতে পারেন: চিরকুমার থাকাকে প্রশংসা করুন এবং যে সব অবিবাহিত শিক্ষক আছেন তাঁদের ঠিক মতো ব্যবহার করুন।

● আমাদের স্কুলব্যবস্থার সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ৪,১১,০০০। তার মধ্যে ৮৮,০০০ অকৃতদার? এই ৮৮ হাজারের মধ্যে ৫৩ হাজার শিক্ষক কোনোদিনই বিয়ে করবেন না।[৪৩] সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করুন না, এটা দুর্ভাগ্য নয়,

---

৪৩: এই পরিসংখ্যান আমরা সাজিয়েছি জন্ম-মৃত্যুহার সংক্রান্ত পৌর নথিপত্র দেখে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, অন্য সব জীবিকার মানুষের বৈবাহিক ধারা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঠিক কোন্ হারে বর্তমানে জীবিত

এ একটা আশীর্বাদ — সর্বাত্মক শিক্ষক হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়।

আজকাল বলা হয় অকৃতদার শিক্ষকদের মধ্যে মানবিকতা বোধটা একটু কম। কথাটার কতটা ভিত্তি আছে জানি না। তবে এমন হতেই পারে যে, যেদিন চিরকৌমার্য নিঃস্বার্থ অভিরুচির ব্যাপার হবে সেদিন শিক্ষকরা স্কুলকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসবেন, শিশুদের দিকে তাকাবেন পরম স্নেহে, শিশুরা ভালবাসবে তাঁদের গভীরভাবে। সবচেয়ে বড় কথা, একটা সর্বাঙ্গীণ সফল স্কুল চালানোর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন তাঁরা।

চব্বিশ ঘণ্টা কাজ এবং ইউনিয়নের অধিকার

● **মহান সংগ্রাম** শিক্ষক ইউনিয়নের একটা পত্রিকা পড়ছিলাম। বজ্রকণ্ঠে সেখানে ঘোষণা: "না। শিক্ষণ সময়ের বৃদ্ধি কোনোমতেই না। অনেক মহান আন্দোলনের ফলে শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক সময়সীমা পরিমিত রাখা হয়েছে। পিছিয়ে আসা হবে মূর্খামি।"[৪৪]

ভড়কে গেলাম আমরা। সেভাবে দেখলে, কিছু বলার নেই। সব কর্মচারীরই অধিকার আছে কাজের ঘণ্টা কমানোর জন্য আন্দোলন করার। করাই উচিত।

● **অস্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা** আপনার কাজের সময়সূচী কিন্তু সত্যিই লজ্জাজনক।

একজন শ্রমিক বছরে ২,১৫০ ঘণ্টা খাটে। সরকারী দপ্তরগুলিতে আপনার সহকর্মীরা কাজ করেন বছরে ১,৬৩০ ঘণ্টা। সেখানে, একজন প্রাথমিক শিক্ষক কাজ করেন বছরে ৭৩৮ ঘণ্টা। একজন অঙ্ক অথবা বিদেশী-ভাষা শিক্ষক কাজ করেন ৪৬৮ ঘণ্টা।[৪৫]

শিক্ষকরা বিয়ে করতে থাকবেন এটা বলা অসম্ভব, কারণ আমরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই। আলাদা করে দেখলে: পুরুষ অবিবাহিত শিক্ষকের সংখ্যা হল ৩৩,০০০, মহিলা ৫৫,০০০। যাঁদের ভাগ্যে বিয়ে মোটেই নেই তেমন, পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা ১৪,০০০ এবং মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা ৩১,০০০।

৪৪: "স্কুল পুনর্গঠন", ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৬।

৪৫: বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য: ২৩নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ভাষা বা অঙ্ক শিক্ষকদের মোট কাজের সময় পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য শিক্ষকদের সমান।

আপনি বলেন, আপনাকে বাড়িতে পড়তে হয়, খাতা দেখতে হয়। এ যুক্তি ধোপে টেঁকে না। বিচারপতিদেরও বাড়িতে বসে রায় আর দণ্ডাদেশ লিখতে হয়। তাছাড়া, পরীক্ষা তো ইচ্ছে করলে আপনি নাও নিতে পারেন। অথবা, পরীক্ষা নিলেও, ছাত্রদের সাথেই বসে, পরীক্ষা চলাকালেই আপনি খাতা দেখে ফেলতে পারেন।

আর পড়াশোনা আর পড়াবার জন্য তৈরি হওয়ার কথা বলছেন? পড়তে আমাদের সকলকেই হয়। শ্রমিকদের আরও বেশি পড়তে হয়। সান্ধ্য স্কুলে পড়তে এসে ওরা কি পারিশ্রমিক দাবি করে?

মোট কথা হল, আপনাদের কাজের ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছেন মালিকরা নিজেদের স্বার্থে, একটা অদ্ভুত বিশেষ সুবিধা দানের জন্য। ইউনিয়নের মাধ্যমে কিছু জিতে নেননি আপনারা।

● **স্নায়বিক বিপর্যয়** ওই একই পত্রিকায় পড়লাম, আপনাদের শিক্ষণ সময় নাকি এত মারাত্মক বেশি যে তা "যে কোনো স্বাভাবিক মানুষের মানসিক, শারীরিক ক্ষমতাকে নিঃশেষিত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।"

একজন শ্রমিক একটা স্ট্যাম্পিং যন্ত্রের পাশে আট ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে সবসময় হাত কাটা যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে। কাজেই এ ধরনের কথা ওদের সামনে বলবেন না। বিপদ হতে পারে।

ওদিকে মজা দেখুন, হাজার হাজার শিক্ষক রয়েছেন কিন্তু তাঁরা অতিরিক্ত পয়সার বিনিময়ে আলাদা করে ছাত্র পড়াতে সব সময় রাজী। তাতে তাঁদের ক্লান্তিটান্তি নেই। এঁদের যতক্ষণ না তাড়াচ্ছেন ততদিন আপনারা আমাদের পক্ষের লোক হতে পারবেন না। আপনারা শ্রমিক, আপনাদের ইউনিয়ন করার অধিকার আছে, এ সব কথা হজম করা একটু মুশকিল।

● **ধর্মঘট** যেমন ধরুন, ধর্মঘট। প্রত্যেক শ্রমিকের পবিত্র অধিকার। কিন্তু যে লোকের কাজের সময়সূচী আপনার মতো তিনি যখন ধর্মঘট করেন তখন ব্যাপারটাকে ঘৃণিত মনে হয়।

গান্ধীকে নিয়ে একটু পড়াশোনা করুন। দেখবেন ধর্মঘটের সমান ফলপ্রসূ নানা পদ্ধতি আছে দাবি আদায়ের। কিন্তু সে সব পদ্ধতির চেহারা আলাদা।

তবে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে ভাষা শিক্ষা "ঐচ্ছিক-আবশ্যিক" হয়ে যাওয়ার পর থেকে যে সব কলেজে বাংলা বা ইংরেজিতে "অনার্স" নেই, সে সব কলেজে ভাষা শিক্ষকদের কাজের সময় কমে গেছে।

একটা উৎকৃষ্ট সমাধান বাত্‌লাতে পারি। আপনারা বিচারপতিদের ইউনিয়নে যোগ দিন। যে সব সময়ে আপনারা বিচারকের কাজ করেন, যখন পরীক্ষা নেন, নম্বর দেন, পাশ-ফেল করান, সে সব সময়ে বরং ধর্মঘট করুন। এই সব কাজ বন্ধ করে দিন।

তা না করে কেবল যদি ওই সামান্য যে ক'ঘণ্টা আমাদের পড়ান সেই সময় ধর্মঘট করেন, তাহলে লোকের মনে হবে আমাদের প্রতি আপনাদের বিন্দুমাত্র দরদ নেই, কোনো মাথাব্যথা নেই আমাদের সম্পর্কে।

● **পূর্ণ সময়ের জন্য পড়াবে কে?** স্কুল আজকে গরিবের শত্রু। যে সময়সূচী অনুসারে বর্তমানে স্কুল চলে তাতে এ কথা বলতেই হয়। আরও দীর্ঘ সময় পঠনপাঠন করাবার ব্যবস্থাই যদি না করতে পারেন তাহলে সরকার স্কুলের দায়িত্ব দিয়েছেন কেন?

এ কিন্তু একটা মারাত্মক সিদ্ধান্তে এলাম আমরা। এতদিন পর্যন্ত মনে করা হ'ত ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন স্কুলের চাইতে সরকারি স্কুলগুলো উন্নততর। এখন কিন্তু সবকিছু আমাদের ফিরে ভাবতে হতে পারে। অন্য কারো হাতে স্কুলের পরিচালনভার অর্পণ করতে হতে পারে। কোনো প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর হাতে। যিনি আমাদের সত্যিই পড়াতে চাইবেন।

● **সাবধানে কথা বলুন** অবাস্তব ভাবনা ভেবে লাভ নেই অবশ্য। সকালে এবং শীতকালে, সরকারকে স্কুল চালাতে দেওয়া যাক। সরকার "শ্রেণীহীন" করে তুলুন স্কুলগুলোকে (শব্দের অর্থ বুঝে নিন: বড়লোকদের শ্রেণী-বিদ্বেষকেই বলে "শ্রেণীভিত্তিহীনতা")।

বিকেলে, আর গ্রীষ্মকালে স্কুলের ভার নিন ওই শিক্ষাব্রতী। শ্রেণী-বিভেদকে দূরীভূত করে স্কুল চালনা করুন তিনি (শব্দের অর্থ বুঝে নিন: শ্রেণীবিভেদ না রাখাকে বড়লোকেরা বলবে "শ্রেণীবিদ্বেষ")।

● **শহরের প্রশাসন** সমাধানের প্রথম সূত্র হল শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চেপে ধরা। তাঁরা দেখান আমাদের, স্কুল নিয়ে তাঁদের যে রাজনীতি তা সাধারণের উপকারে আসে কিনা। বাঁধানো রাস্তা, নতুন নতুন আলো, খেলার মাঠ এ সব তো রাজতন্ত্রবাদীরাও দিতে পারে আমাদের।

যদি আঞ্চলিক প্রশাসন পরিষদ নির্ধারিত টাকা কাটছাট করে বলে, "এই বিষয় নগর প্রশাসনের এক্তিয়ারের বাইরে পড়ে"—তাহলে শহরের মানুষকে পাল্টা যুক্তি সহকারে বলতে হবে, এই আইন প্রণয়ন করেছিল ফ্যাসিবাদীরা

১৯৩১ সালে, সুতরাং এই আইন সম্পর্কে আপত্তি আছে।

"প্রিফেক্ট-এর"[৪৬] উপরে দোষ চাপিয়ে নিজেরা চুপ করে বসে থাকা অতি সহজ।

● **কমিউনিস্টরা** শহরের প্রশাসনকে নাড়ানো যাবে না হয়তো কিন্তু কমিউনিস্টরাও শ্রেণীসমস্যা দেখলে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। তারা কি ব্যবসায়ী আর উচু মাইনের (white collar) শ্রমিকদের শত্রুতা কুড়োতে সাহস পাবে?

পার্টির একজন বড় নেতা জোর দিয়ে বলেছেন, "আমরা যখন ক্ষমতায় আসব" তখন স্কুলগুলো সরকারি তত্ত্বাবধানেই থাকবে। দেশ মুক্ত হওয়ার পর কুড়ি বছর কেটে গেছে। কমিউনিস্টরা ওই ক্ষমতা এখনও পায়নি। আমরা বসে আছি হাপিতেশ করে, কবে ঘাস গজাবে। ততক্ষণে গরুগুলো কিন্তু মরে হেজে গেল এদিকে।

● **গির্জার পাদ্রিরা** গির্জার পাদ্রিরা হয়তো "ডোপোস্কুওলা" চালাতে পারতেন।

কিন্তু ঈশ্বরের যেমন তাঁর সন্তানদের প্রতি আপোষবিহীন ভালবাসা আছে, পাদ্রিদের অনেকের মধ্যেই সেই ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা মনে করেন বড়লোকদের সাথে মানিয়ে চলাই তাদের শিক্ষিত করে তোলার একমাত্র উপায়।

● **ইউনিয়ন** শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন বলতে তো ঐ ইউনিয়নগুলো। সুতরাং "ডোপোস্কুওলা" চালু করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ইউনিয়ন সদস্যদের। কিন্তু ইউনিয়নের সদস্যরা এখন এদিকে কান দিচ্ছে না। তারা বলছে, আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিটি গণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্তব্য বাঁধা আছে এবং অন্যের এলাকায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

এদের মধ্যেও সেই এক ধরনের ভীরুতা।

অথচ, তারা সবচেয়ে অভিযোগ করে বলছে, আজকের যুবশক্তি সব কিছু সম্পর্কেই নিস্পৃহ। তারা বলে, সংঘবদ্ধ ধর্মঘট-আন্দোলন করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে, নতুন সদস্য জুটছে না, নিরবচ্ছিন্ন কাজের জন্য কর্মী পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে। মালিকপক্ষকে স্কুলগুলো দখল করে রাখতে দিলে, ছেলেমেয়েদের সেই স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে দিলে এমন

৪৬ঃ ইংরেজি অনুবাদকের মন্তব্যঃ আঞ্চলিক সরকারের প্রধানকে "প্রিফেক্ট" বলা হয়।

তো হবেই!

● **চেষ্টা করে দেখুন না** আরও বহুদিন দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরার পরে ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের বোধোদয় হবে। ততদিন কিছু স্থানীয় পরীক্ষা বা নিরীক্ষাও তো চালানো যায়।

দুই বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন, "ইটালিয় শ্রমিক সাধারণ ফেডারেশন" এবং "মুক্ত ইউনিয়নের ইটালিয় ফেডারেশন" একযোগে এই চেষ্টা চালাতে পারে। এই চেষ্টা চালানোর ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেই বা আপত্তি কী?

একটা স্কুল চালাতে খরচা সামান্যই। কিছু খড়ি লাগবে, একটা ব্ল্যাক-বোর্ড, গোটাকতক পুরানো বই, চারজন একটু বড় ছেলে ছোটদের পড়াবে, আর মাঝেমধ্যে একজন অবৈতনিক অধ্যাপক কিছু নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলে যাবেন — এই তো!

সর্বাত্মক স্কুল আর বিষয়বস্তু

● **ডন বর্ষি** এই চিঠিটা আমরা যখন লিখছি তখন ডন বর্ষি[৪৭] একদিন স্কুলে এলেন। তিনি আমাদের সমালোচনা করে বললেনঃ "তোমাদের তো দেখছি স্থির বিশ্বাস—প্রত্যেকটি ছেলেকে স্কুলে যেতে হবে এবং গোটা দিন পড়তে যেতে হবে। কিন্তু অন্য সকলের মতো এরাও এক একটা রাজনীতিবিমুখ স্বার্থপর ব্যক্তি তৈরি হবে। এদের মধ্যেই ফ্যাসিবাদ দানা বাঁধে।

"সেই গতানুগতিক শিক্ষকের দল সেই একই ধরনের পাঠ্যবস্তু যতদিন পড়িয়ে যাবেন, ততদিন ছেলেরা স্কুলে যত কম পড়বে ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। কারখানা এর চেয়ে অনেক ভাল স্কুল।

"শিক্ষক আর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পাল্টাতে হলে এই চিঠিটা লিখলেই শুধু হবে না। এইসব সমস্যার সমাধান করতে হবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।"

৪৭ঃ ইংরেজি অনুবাদকের বক্তব্যঃ ডন বর্ষি একজন পাদ্রি, ডন মিলানীর বন্ধু এবং সহকর্মী। যে সামান্য ক'জন পাদ্রি শ্রমিক শ্রেণী থেকে এসেছেন এবং এক সময় শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে অনুমতি পেয়েছেন, ইনি তাঁদের একজন।

● **নাই মামা না কানা মামা** কথাটা একদম ঠিক। যে লোকসভা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ না দেখে সমগ্র জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে পারবে, সেই লোকসভা সোজা দু'টো ফৌজদারী আইন করে আপনাকে এবং আপনার স্কুলের পাঠক্রমকে সিধে করে দিতে পারত।

কিন্তু, আগে তো লোকসভায় আমাদের ঢুকতে হবে। কালো চামড়ার মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আইন শ্বেতাঙ্গরা তো আর বানাবে না!

লোকসভায় ঢুকতে হলে সবার আগে আমাদের ভাষায় দখল বাড়াতে হবে। ততদিন পর্যন্ত, উন্নততর কোনো বিকল্পের অভাবে, ছেলেমেয়েদের আপনার ওই স্কুলেই পড়তে যেতে হবে।

● **পেশাগত অঙ্গবিকৃতি** তাছাড়া, ডন বর্ঘি যেমন ভাবছেন সব শিক্ষকই তো আর তেমন ওঁচা নন!

এমন হতেই পারে, আপনার বিকৃতি শুরু হয়েছে স্কুলে পড়ানো শুরু করার পরে। কোনোরকম গরিব বিদ্বেষ থেকে আপনি ছোট ছোট "বাবু"দের খাতির করেছেন এমন তো নয়। আসলে এই "বাবুরা" আপনার ঠিক মুখের সামনে এত বেশি সংখ্যায়, এত বেশিক্ষণ বসে থেকেছে যে, আপনি ক্রমশ ওদেরই কেবল ভালবাসতে শুরু করেছেন।

ওদের ভাল বাসতে বাসতে ওদের পরিবারগুলোকে, ওদের জগৎটাকে, ওদের বাড়িতে পঠিত খবরের কাগজটাকে পর্যন্ত আপনি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছেন।

যে লোক আরামের জীবন আর ভাগ্যবান ব্যক্তিদের পছন্দ করে সে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকবেই। কোনো পরিবর্তনই সে চাইবে না।

● **গরিব মানুষের দাবি** কিন্তু এখন দিনকাল বদলাচ্ছে। আপনি যতই ফেল করান না, স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বেড়েই চলেছে।

বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনের তাগিদে গরিব জনগণ যখন চাপ দিয়েই চলেছে, তখন আপনি কেবল পিয়েরিনো-র জন্য তৈরি একটা পাঠক্রমকে ক'দিন জিইয়ে রাখবেন?

সর্বাত্মক স্কুল হলে তো একেবারেই পারবেন না। গরিব ঘরের ছেলে-মেয়েরা আপনাকে নতুন করে গড়ে তুলবে, পাঠক্রমকেও নতুন রূপ দেবে।

গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের বুঝতে শেখা আর রাজনীতি ভালবাসা একই ব্যাপার। অন্যায় আইনের দ্বারা নিপীড়িত মানুষকে যদি আপনি ভাল-

বাসেন, তাহলে সেই আইনগুলো পাল্টে ন্যায্য আইন তৈরির চেষ্টায় লাগতেই হবে আপনাকে।

এ ক টি ল ক্ষ

● **ধর্মীয় স্কুল** একটা সময় ছিল যখন ধর্মীয় স্কুলগুলি সত্যিই ধার্মিক ছিল।[৪৮] তাদের একটা স্পষ্ট লক্ষ ছিল। সে লক্ষকে শ্রদ্ধা করা সম্ভব। কিন্তু এইসব স্কুলে নাস্তিকদের কোনো স্থান ছিল না।

আপনাদের নতুন মহান ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলগুলোর দিকে আগ্রহ সহকারে সকলে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু পর্বত করল মুষিক প্রসব। দেখা গেল, এ সব স্কুল কেবল ব্যক্তিগত লাভের দিকেই লক্ষ রাখে।

ধর্মীয় লক্ষে এগোবে এমন স্কুল আজ আর নেই। পাদ্রিরা প্রচলিত ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে গেছেন। তাঁরা নম্বর দিচ্ছেন, ডিপ্লোমা বিলোচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের সামনে এখন তাঁরাও বলছেন—অর্থই মোক্ষ।

● **কমিউনিস্ট স্কুল** কমিউনিস্টরা এর চেয়ে আরেকটু উৎকৃষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারত। কিন্তু আমার কথাই ধরুন না কেন। শিক্ষক হয়ে মেপে মেপে কথা আমি বলতে পারব না। সহ্য করতে পারব না, ছাত্রছাত্রীদের চোখে যখন দেখব প্রশ্ন : উনি কি ঠিক সত্যটাই বলছেন, নাকি প্রয়োজনের খাতিরে যা বলা উচিত তাই বলছেন?

সাম্যের জন্য এই মূল্য কি দিতেই হবে?

● **সৎ একটা লক্ষ চাই** লক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। লক্ষটা সৎ হতে হবে। মহান হতে হবে। ছাত্রদের বলতে হবে প্রকৃত মানুষ হও; কম কিছু হলে চলবে না। ঈশ্বরবিশ্বাসীই হোন আর নাস্তিকই হোন, কাউকে সত্যিকারের মানুষ হতে বলতে তো কোনো আপত্তি হবে না!

এই লক্ষের কথা আমি জানি। আমার পাদ্রি-শিক্ষক আমার এগারো বছর বয়স থেকেই এই কথা আমাকে নিরন্তর বুঝিয়ে গেছেন। এ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমার অনেক সময় বেঁচেছে এর ফলে। আমি পড়াশোনা

---

৪৮ : যে সব স্কুলে সোজাসুজি ছাত্রদের মধ্যে কোনো একটা বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে ভক্তি রোপণ করতে চেষ্টা করা হয়, সে সব স্কুলকে ধর্মীয় স্কুল বলা হয়।

করি কোন্ লক্ষে পৌঁছতে — তা আমার কাছে স্পষ্ট থেকেছে সর্বদা।

● **সঠিক লক্ষ** মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে — এটাই সঠিক লক্ষ।

এই শতাব্দীতে, মানুষের প্রতি আপনার ভালবাসা প্রকাশ করতে হলে রাজনীতিতে অংশ নিতে হবে, ইউনিয়ন করতে হবে, স্কুলে পড়াতে হবে। আমরাই সর্বশক্তিমান জনগণ। ভিক্ষে করার দিন চলে গেছে। রাস্তা বেছে নিতে হবে লড়বার — শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে, নিরক্ষরতা, জাতি বিদ্বেষ আর ঔপনিবেশিক-যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে।

● **আশু লক্ষ** এ হল চরম লক্ষ। এই লক্ষ সামনে রাখতে হবে বরাবর। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আশু লক্ষটির কথাও মনে রাখতে হবে। আমাদের অপরের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে শিখতে হবে। শিখতে হবে কী করে নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হয়।

ইটালিয় ভাষা এই কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। পৃথিবীতে এ ভাষা খুব বেশি ব্যবহার হয় না। মানুষকে ভালবাসতে হবে রাষ্ট্রীয় সীমানার বাধা অতিক্রম করে। তাই আমাদের বিভিন্ন প্রাণবন্ত বিদেশী ভাষা শিখতে হবে।

বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত শব্দ চয়ন করেই ভাষা গড়ে ওঠে। তাই সব বিষয়ই আমাদের শিখতে হবে অল্প অল্প। তবেই আমাদের জানা শব্দের সংখ্যা বাড়বে। জানতে হবে আমাদের সব বিষয়ই অল্পবিস্তর, কিন্তু ভাষার ব্যবহারে আমাদের হতে হবে সম্পূর্ণ পারদর্শী।

● **ক্রুপদী সাহিত্য না বিজ্ঞান** লোকসভায় যখন নতুন ইন্টারমিডিয়েট স্কুল নিয়ে বির্তক চলছিল তখন আমরা, যাদের মুখে ভাষা নেই, যারা বোবা, তারা চুপ করে ছিলাম। কেন? কারণ আমরা তো লোকসভার কেউ নই। ইটালির কৃষক সমাজের জন্য স্কুল কীভাবে চলবে তা নিয়ে আলোচনার সময় কৃষকদেরই দূরে সরিয়ে রাখা হল।

দুই দলে চলল অনন্ত আলোচনা। বাহ্যত দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ বিরোধ। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় দু'জনের বক্তব্যে কোনো সত্যিকারের ফারাক নেই।[৪৯]

৪৯ঃ বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য ঃ এদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে যে বিতর্ক চলে তার চেহারা ঠিক এইরকম। পক্ষে, বিপক্ষে যে সব

এরা সবাই লাইসিও থেকে পাশ করেছে। জন্মাবধি যেখানে তারা আবদ্ধ, সেই পরিচিত গণ্ডির বাইরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই এদের। কোনো যুবক ভদ্রলোকের পক্ষেই তাঁর নিজস্ব বিকৃত সাংস্কৃতিক পরিবেশকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়—যতক্ষণ না তিনি ওই সংস্কৃতি থেকে আহরিত ধ্যান-ধারণার আওতার বাইরে যেতে পারছেন। নিজের ছায়ার সাথে কি আর যুদ্ধ চলে, না কি নিজের গায়ে নিজে থুতু দেওয়া যায়?

লোকসভা গেল দু'দলে ভাগ হয়ে। দক্ষিণপন্থীরা ল্যাটিন ঢুকিয়ে দিতে চাইল স্কুল পাঠক্রমে। বামপন্থীরা বিজ্ঞানের সমর্থনে সোচ্চার হলেন। কেউ আমাদের কথা ভাবলেন না। সমস্যাটা ভেতর থেকে দেখার চেষ্টা করলেন না কেউ। বোঝার চেষ্টাই করা হল না যে, আপনাদের স্কুলে আমাদের কী ধরনের লড়াই-এর মুখোমুখি হতে হয়।

দক্ষিণপন্থীদের স্থান হওয়া উচিত যাদুঘরে। আর কমিউনিস্টরা হল গিনিপিগ। দু'জনেই আমাদের থেকে বহু দূরের লোক। আজকের দিনের ভাষা, ভাব প্রকাশের ভঙ্গি শেখা আমাদের ভীষণ দরকার। সে ভাষা এখনও আমরা ব্যবহার করতে শিখিনি। গতকাল যে ভাষা চালু ছিল তা শিখে আমরা কী করব? আর, আমাদের শিখতে হবে ভাষা, কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আমাদের।

● **সার্বভৌম** বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সমতার একমাত্র মানদণ্ড ভাষা। সমান তাকেই বলব যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যের বক্তব্য বুঝতে পারে। বড়লোক, গরিবলোক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু তাকে কথা বলতে জানতেই হবে।

মন্ত্রীমহোদয়রা মনে করেন আমরা সকলেই এক্সরে ডাক্তার বনে যেতে চাই, নামের আগে "ডাঃ" বসাতে চাই প্যাড ছাপিয়ে। "পড়াশোনা উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কোনো মেধাবী এবং উপযুক্ত ছাত্রের

যুক্তি চালাচালি হয় তাতে মৌলিক তফাৎ বিশেষ চোখে পড়ে না। শুধু তাই নয়, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মেধাভিত্তিক অভিজাত শিক্ষার কথা প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা আছে তার বিরোধিতা কেউ করছে না। এই বিতর্কে সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, জনগণের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলাই হবে বাতুলতা।

অধিকার।"[৫০]

আসুন, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের আরও উঁচু এক লক্ষের দিকে হাত বাড়াতে শেখাই। শেখাই প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম জনগণের একজন হয়ে উঠতে। "ডাক্তার", "ইঞ্জিনীয়ার"—এ সব শব্দ ভুলে যেতে শেখাই।

● **সামাজিক ধান্দাবাজি** যখন আমরা সবাই নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করে নেব, তখন ওই সামাজিক প্রতিপত্তির কাঙালরা যত পারে নিজের স্বার্থে পড়া চালাক, আমরা কিছু বলব না। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাক। সব ক'টা ডিপ্লোমা দখল করুক, টাকার কুমীর হোক, সব ক'টা বিশেষজ্ঞের চাকরিতে গেঁড়ে বসুক।

কিন্তু তাদের বর্তমান অভ্যাসটি ছাড়তে হবে। ক্ষমতার সিংহভাগ আর দাবি করা চলবে না।

● **ঝরে যাবে** বেচারি পিয়েরিনো, তোমার জন্য দুঃখ হয় একটু একটু। তোমার অধিকারগুলোর জন্য কম মূল্য দিতে হয়েছে তোমাকে? তোমার চামড়ায় মার্কা মারা রয়েছে বিশেষজ্ঞ বলে। তোমার পুঁথিপত্র, তোমারই মতো আর পাঁচজনের কলুষস্পর্শ তোমাকে পৃথক করে রেখেছে। এবারে ছাড় না এইসব!

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দাও, তোমার ওইসব দায়িত্ব ছুঁড়ে ফেল, রাজনৈতিক দল থেকে ইস্তফা দাও। পড়াতে শুরু করো। ভাষা জোগাও মূক মুখে। আর কিছু লাগবে না।

নিজেকে ভুলে যাও, গরিবের জন্য পথ তৈরি করো। পড়াশোনা বন্ধ করো। শুকনো পাতার মতো ঝরে যাও। তোমার শ্রেণীর এই হল শেষ দায়িত্ব।

● **বাঁচাও** পুরানো বন্ধুদের বাঁচাতে চেষ্টা কোরো না। তাদের পিছুটানে আবার পড়লে চিরকালের জন্য তুমি যা আছ তাই থেকে যাবে।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার ভাবার দরকার নেই। ওই পথে বহু পথিক থাকবে বরাবর নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। আমাদের পক্ষে উপকারী এমন কিছু কিছু জিনিস ওরা আবিষ্কারও করবে। ওরা মরুভূমিতে

---

৫০ : সংবিধানের ৩৪তম ধারা।

জলসেচ করবে, সমুদ্র থেকে মাছের কোর্মা তুলে আনবে, রোগ নিরাময় করবে।

তোমার তাতে কী? নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিও না, ভালবাসাকে বিসর্জন দিও না। তোমাকে ছাড়াই যে সব জিনিস নিজেদের গতিতে এগিয়ে চলবে, তাদের সাথে নিজেকে জড়ালে তুমি মানুষ হয়ে বাঁচতে পারবে না।

দ্বিতীয় ভাগ

"ম্যাজিস্ট্রেলে"ও আপনি ফেল করান, কিন্তু...

ইং ল্যা ন্ড

● **আসল পরীক্ষা** ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে আমি ইংল্যান্ডে গেলাম। পনেরো বছর বয়সে। প্রথমে কিছুদিন ক্যান্টারবেরিতে এক কৃষকের কাছে কাজ করলাম। তারপরে কাজ পেলাম লন্ডনে এক মদের ব্যবসায়ীর কাছে।

আমাদের স্কুলে আমরা বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আপনার স্কুলের পরীক্ষার সামিল বলে ভাবি। বিদেশ ভ্রমণের মধ্যে অবশ্য পরীক্ষা ও সাধারণ স্কুলের দৈনন্দিন শিক্ষালাভ দু'টোই মিশে থাকে। আমরা স্কুলে যে সংস্কৃতি অর্জন করি তাকে জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিই।

আমাদের এই পরীক্ষা আপনার পরীক্ষার চাইতে অনেক বেশি শক্ত। কিন্তু এই পরীক্ষার সময়ে আমরা কতগুলো বস্তাপচা জিনিসের পিছনে সময় নষ্ট করি না।

● **সুয়েজ** আমার পরীক্ষা ভালই হল। জ্যান্তই বাড়ি ফিরলাম। কিঞ্চিৎ টাকাও আনলাম সঙ্গে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, আমি ফিরলাম বহু নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে। অভিজ্ঞতাগুলো অন্তরে গ্রহণ করেছিলাম। তাই আমি তা অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে পেরেছিলাম।

আমাদের পরিবারে রেনাটো খুড়ো ছাড়া কেউ কোনোদিন বিদেশ যায়নি। তিনি গিয়েছিলেন ইথিওপিয়া, যুদ্ধে যোগ দিয়ে। ছোটবেলায় যখন প্রথম ভূগোল পড়ছি, ও'কে বলেছিলাম সুয়েজ ক্যানাল সম্পর্কে কিছু বলতে। দেখলাম, উনি জানেন না যে, সুয়েজের মধ্য দিয়ে ও'কে যেতে হয়েছিল।

● **যুদ্ধবিরোধী** অমন বিদেশ যাত্রায় আমাকে কেউ পাঠাতে পারবে না। আমি কৃষক খুন করতে পারব না। ইংল্যান্ডে এক কৃষকের ঘরেই তো বাস করেছিলাম। আমার বয়সী একটি ছেলে ছিল সেখানে। ছিল আরও ছোট একটি মেয়ে। ওদের একটি গোলাবাড়িতে হ'ত আলুর চাষ। তারা আমাদেরই

মতো খেটে খাওয়া মানুষ। ওদের খুন করব কেন?

তুলনায় আপনি আমার কাছে পরদেশী। কিন্তু চিন্তা করবেন না — খুনোখুনি অপছন্দ করার শিক্ষাই পেয়েছি।

● **ককনি**[১] (Cockney) ক্ষেত-খামারে অবস্থা যতই খারাপ হোক না, লণ্ডনে ওদের অবস্থা আরও খারাপ। শহরে বড়বাজার অঞ্চলে মাটির নিচে কাজ করতাম আমরা। ট্রাক থেকে মাল খালাসের কাজ। আমার সাথী মজুররা ছিল ইংরেজ, কিন্তু ইংরেজিতে একটা চিঠিও তারা লিখতে জানত না। প্রায়ই ওরা ডিককে বলত চিঠি লিখে দিতে। ডিক আবার কখনো কখনো আমার কাছে পরামর্শ চাইত। ভাবুন! একজন ইংরেজ ইংরেজি লেখার ব্যাপারে আমার কাছে পরামর্শ চাইছে, যে আমি ইংরেজি শিখেছি রেকর্ডে শুনে শুনে। ডিকও ওদের মতো শুধু "কক্‌নি"-ই বলতে পারত।

আমাদের মাথার পনেরো ফুট উপরে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন লোকজন যারা নাকি "রানীর ইংরেজি" (Queen's English)[২] ছাড়া কিছু বলে না।

তথাকথিত শুদ্ধ ইংরেজি থেকে "কক্‌নি" যে খুব আলাদা তা নয়। কিন্তু "কক্‌নি" যে বলবে সে নিচু তলার লোক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। ইংরেজরা স্কুলে ছাত্রদের ফেল করায় না। কিন্তু পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের তারা পাঠিয়ে দেয় নিচু মানের স্কুলে। ফলে কী হয়? গরিব ঘরের ছাত্ররা "অশুদ্ধ" ভাষায় কথা বলায় আরো বেশি অভ্যস্ত হতে থাকে, আর বড়লোকরা নিজেদের ভাষাকে সুচারুতর করে তোলে নিশ্চিন্তে। একজন ছাত্রের বাচনভঙ্গি দেখে বলে দেওয়া যায় তার আর্থিক অবস্থা কেমন এবং তার বাবা কী কাজ করে। বিপ্লব যখন ঘটবে তখন কেমন সুন্দর এই দুই পক্ষ পরস্পরের পেটে ছুরি মারতে পারবে বলুন তো!

● **দেওয়ালে মাথা কুটে** যখন ইটালি ফিরলাম তখন দেখলাম, ভুলে গেছি যে আমি মুখচোরা।

বিভিন্ন দেশের সীমান্তে নিজের পরিচয় বুঝিয়েছি, মালিকের সঙ্গে আর

১ঃ ককনি (Cockney): লণ্ডনে শহরে গরিবদের কথ্য ভাষা।

২ঃ বাংলা অনুবাদকের টীকা: রানীর ইংরেজি — ইংল্যাণ্ডে অভিজাত ও উচ্চবিত্ত লোকজন যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করে এবং যে ধরনের উচ্চারণে অভ্যস্ত।

বহু রাজতন্ত্রবাদীর সঙ্গে তর্ক করেছি, জাতি বিদ্বেষের মুখোমুখি হয়েছি, নানা রকম বিকৃতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছি, পয়সা কী করে বাঁচানো যায় ভেবেছি, নিজে নিজে কত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিচিত্র সব খাবার খেয়েছি, চিঠির অপেক্ষায় দিন গুণেছি, বুকে চেপে রেখেছি পিছুটান। তাই দেশে ফিরে মনে হল, সব কিছুর মোকাবিলা করেছি। সর্বত্র জয়ী হয়েছি।

কিন্তু যে বস্তুটির জুড়ি মেলেনি — তা হল এই "ম্যাজিস্ট্রেল"। এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ঠিক মনে হচ্ছে দেওয়ালে মাথা কুটে মরছি।

● **হয় আপনি নয় আমরা** অথচ, দেখেছি আমার সাথে স্কুলে যারা পড়েছে তারা কেউ কোথাও ব্যর্থ হয়নি। তাদের কেউ কেউ এখন ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় পেশাদার কর্মী, কাজ করছে খুব দক্ষতার সাথে। অনেকেই ফ্লোরেন্সের বিভিন্ন কলে-কারখানায় কাজ করছে, কেউ তাদের ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখতে পারছে না, তারা ইউনিয়নে কাজ করছে, রাজনীতি করছে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথেও কেউ কেউ যুক্ত।

এমনকি টেকনিক্যাল স্কুলে যে দু'জন যোগ দিয়েছিল, তারাও সেখানে সফল হয়েছে। পিয়েরিনোদের মতোই তারাও সময়মতো এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে গেছে।

বাস্তব জীবনের পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে আমাদের সংস্কৃতি কোথাও খাটো হয়নি। কেবল এই "ম্যাজিস্ট্রেল"-এর দেওয়ালের মধ্যে দেখলাম আমাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

একটু তলিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে। আপনি একদিকে, অন্যদিকে আমি, আমাদের মধ্যে একজন নিশ্চয় বিপথে চলেছি।

● **প্রতিদিনের রুটিন** ভোর পাঁচটায় উঠতাম ফ্লোরেন্স-এ যাওয়ার জন্য। মোটরবাইকে ভিচ্চিও, সেখান থেকে ট্রেনে। ট্রেনের কামরায় পড়াশোনা করা দুরূহ কাজ। ঘুম পায়, ভীষণ ভিড়, হট্টগোল।

স্কুলের দরজায় পৌঁছে যেতাম আটটার মধ্যে। তারপর দাঁড়িয়ে থাকতাম অপেক্ষায়। কাদের অপেক্ষায় জানেন? যে সব বাবাজিরা সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠে স্কুলে আসবে ধীরেসুস্থে, তাদের জন্য। প্রতিদিন ওদের হাতে থাকত আমার চেয়ে চার ঘণ্টা বেশি সময়।

● **প্রথম দিকের রুটিন** পয়লা অক্টোবর আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম

ওখানে। কিন্তু আপনি উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের বলা হল, ছ'তারিখ এসো। "লিওনার্ডো" স্কুলের ছাত্রদের বলে দেওয়া হল তেরো তারিখ যেতে।

এরকম দেরি করা হল কেন? খানিকটা সাধুসন্তদের নাম করে, খানিকটা নিছক আলস্যে। স্কুলে গরিবদের হাত থেকে একটা দিন চুরি করার অজুহাত হিসাবে সন্ত ফ্রান্সিসকেও ওরা ব্যবহার করে। গ্রীষ্মের সময়ে চার মাস স্কুল নষ্ট হয়েছে কিন্তু এর আগেই।

এই আলস্যের জন্য দায়ী কে তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। স্কুলগুলোই দায়ী কি? স্কুলের পরিচালকমণ্ডলী? না কি দায়িত্বটা শিক্ষা মন্ত্রকের? এরা সকলেই তো মাইনে পায় বছরে তেরো মাস।[৩]

একজন শ্রমিক যদি পাঁচ মিনিট দেরি করে কাজে আসে তাহলে তার অর্ধেক দিনের বেতন কাটা যায়। বারে বারে দেরি করলে তার চাকরি চলে যেতে পারে।

আপনাকে তো চালনা করে সরকার। তেমনি রেল কোম্পানিও সরকার পরিচালিত। ট্রেন চলা কিন্তু কখনো বন্ধ হয় না। নিশ্চিন্তে ট্রেনে চড়ি আমরা। কারণ, জানি সিগন্যাল দেবার লোক ঠিক জায়গায় হাজির আছে। শীতে-গ্রীষ্মে, দিনে-রাতে। ওদের একজনও যদি একদিন কামাই দেয়, পরের দিন সব খবরের কাগজে তা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে। কাজ ভাগাভাগির খুঁটিনাটি নিয়ে কোনো ওজর আপত্তি তোলা চলে না ওদের। বাচ্চার পেট ব্যথার কথা বলেও ওদের নিস্তার নেই। গাফিলতি হলে তাকে সোজা জেলে যেতে হবে।

কেবল আপনার ক্ষেত্রে তাহলে এই বিশেষ ব্যবস্থা কেন?

তাহলে কি স্কুল ভাল করে চালানোর চাইতে ট্রেন নিয়মিত চালানোয় পরিচালকদের আগ্রহ বেশি? তারা খুব জানে যে, তাদের ছেলেমেয়েরা যা কিছু শেখার তা বাড়িতেই দিব্যি শিখবে। কিন্তু ট্রেনের ব্যাপারটা আলাদা।

আপনার মনিব একটা ব্যাপারেই স্কুল সম্পর্কে চিন্তিত। আপনি জুন মাসে ডিপ্লোমা বিতরণ করতে পারবেন তো?

আত্মঘাতী নির্বাচন

● **ভুলে যাওয়া** এই চিঠির প্রথমে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম স্কুল

৩ঃ ইংরেজি অনুবাদকের মন্তব্য ঃ বেশির ভাগ সরকারি কর্মচারীরাই বছরে এক মাসের বেতন বেশি পায় "বোনাস" হিসাবে।

থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ছেলেমেয়েরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফ্লোরেন্সে এসে দেখলাম, বাছাই করা ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হয় সব থেকে বেশি।

যে ছাত্রটি নতুন ক্লাসে উন্নীত হয় সে পুরানো ক্লাস নিয়েই এক ধাপ এগোয়। তার মাস্টারমশাইদের মতোই সেও স্কুলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকে। তার তো উচিত তার স্কুলের সঙ্গীদের বন্ধু করে নেওয়া, তাদের কী হল না হল সে বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া।

কিন্তু সঙ্গীরা সংখ্যায় ভীষণ বেশি। আট বছরে চল্লিশ জন সহপাঠীকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শুকনো পাতার মতো ঝরে গেছে তারা। ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের শেষে আরও পাঁচ জন স্কুল ছেড়ে গেছে, নতুন ক্লাসে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও। তাহলে দাঁড়াল সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ জন। পিয়েরিনো এদের কথা জানতেও পারে না। এদের সমস্যার কথা সে কিছুই শোনে না।

● **নাক উঁচু** দ্বিতীয় বর্ষে পিয়েরিনো ছিল অনেক ছেলের মধ্যে একজন। পঞ্চম বর্ষে সে বাছাই করা ছেলেদের একজন হয়েছে। তাকে পাখিপড়া করে শেখানো হয়েছে — ইতিমধ্যে যে একশ' ছেলে সে দেখেছে তার মধ্যে চল্লিশ জন তার চাইতে "নিকৃষ্ট"।

ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল ছাড়ার পরে এই "নিকৃষ্ট" সহপাঠীদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে একশ'র মধ্যে নব্বই জন। উচ্চতর স্কুলের ডিপ্লোমা পাওয়ার পর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছিয়ানব্বই। কলেজের ডিগ্রি পাওয়ার পর সংখ্যা আরও বেড়ে হয়েছে নিরানব্বই জন।[৪]

প্রত্যেক বছর সে দেখেছে, এইসব উধাও হয়ে যাওয়া সহপাঠীদের চেয়ে সে পরীক্ষায় অনেক বেশি নম্বর পায়। যে শিক্ষক তাকে এই বেশি নম্বর দেন তিনি ওর মনে খোদাই করে লিখে দেন যে, বাকি নিরানব্বই জন ছেলে এক নিচু স্তরের সাংস্কৃতিক জগতের বাসিন্দা।

এই অবস্থায় তার মন তো বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বেই! না পড়লেই আশ্চর্য

৪ঃ ১৯৬১ সালের আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী ইটালিতে প্রাথমিক স্কুল পাশ করেছে ২,৭৫,১০,০০০ জন ছাত্র (৬০·৫ শতাংশ), ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল পাশ করেছে ৪৩,৭৫,০০০ জন ছাত্র (৯·৬ শতাংশ), আপার স্কুল পাশ করে বেরিয়েছে ১,৯৪,০০০ জন ছাত্র (৪·২ শতাংশ) এবং কলেজ ডিগ্রি পেয়েছে ৬,০৩,০০০ জন ছাত্র (১·৩ শতাংশ)।

হতে হবে।

● **গরিবের পুরস্কার** পিয়েরিনোর আত্মা অসুস্থ। কেন জানেন? কারণ ওর শিক্ষকরা ওর কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন। তাকে শেখানো হয়নি যে, বাকি নিরানব্বই জনের সংস্কৃতি ভিন্ন ধরনের, নিম্ন স্তরের নয়।

দুনিয়ায় কোনো লোক এখনও প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান হতে পারেনি। প্রকৃত সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হবে জনগণের একজন এবং ভাষার উপর তার থাকবে সম্পূর্ণ দখল।

যে স্কুলে এই ধরনের নির্বাচন চলে সে স্কুল সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে বাধ্য। এইসব স্কুল গরিবের কাছ থেকে তাদের মনের ভাব প্রকাশের উপায়গুলো কেড়ে নেয়। আর, বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ করার সুযোগ থেকে বিত্তবানদের বঞ্চিত করে।

অভাগা জিয়ানী, মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই ওর। অন্য দিকে জিয়ানীর কপাল কিন্তু খুব ভাল, সে গোটা পৃথিবীটাকে চেনে। আফ্রিকা, এশিয়া আর ল্যাটিন আমেরিকার সব মানুষের সে ভাই। মানবজাতির বৃহত্তম অংশের প্রয়োজনে সে লাগতে পারে দরকার হলেই।

পিয়েরিনো সৌভাগ্যবান, সে কথা বলতে জানে। পিয়েরিনোর কপাল আবার কম খারাপও নয়। সে বড় বেশি কথা বলে। ক'টা জরুরি কথা ওর বলার আছে বলুন তো? ওরই মতো অন্য কারোর লেখা বই-এ পড়া কতগুলো কথা তোতা পাখির মতো উচ্চারণ করে যায় পিয়েরিনো। অতীব মার্জিত কিছু লোকের ক্ষুদ্র এক চক্রের মধ্যে সে বাঁধা — ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন, ভূগোল থেকে বিচ্ছিন্ন।

যে স্কুল ছাত্র বাছাই করে, সে স্কুল ঈশ্বর বিরোধী, মানবিকতার শত্রু। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর গরিবদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন। আপনারা ওদের বোবা বানিয়ে রেখেছেন। তাই ঈশ্বর আপনাদের করে দিয়েছেন অন্ধ।

● **অন্ধ** বিশ্বাস না হলে "ম্যাট্রিকোল"[৫] উৎসবের দিন শহরে আসুন।

---

৫ : "ম্যাট্রিকোল" : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : পরীক্ষা পাশের দিন এই ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খল হতে দেওয়া হয়, পুরস্কার হিসাবে। অসভ্যতাকে ওই দিন বলা হয় "ছেলেমানুষি।" ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজেও এই ধরনের বিচিত্র রীতি আছে।

এই "বাবু"দের বিশেষ সুবিধা ভোগ করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। উল্টে, নিজেদের সামাজিক অবস্থান জাহির করতে একটা বিশেষ টুপি মাথায় পরে তারা সেদিন। তারপর রাস্তার কুকুরছানার মতো সারাদিন নানারকম কীর্তিকলাপ করে বেড়ায় পথে পথে। অশ্লীল রসিকতা করা, আইন ভাঙা, গাড়িঘোড়ার রাস্তা আটকানো, অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি করা — এসব সেদিন তাদের কাছে জলভাত। একজন পুলিশের মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে সেই স্থানে একটা "এনিমা" দেওয়ার রবারের নল জড়িয়ে দেয় এইসব ছেলেরা।

পুলিশটি চুপ করে সহ্য করে সব। তার মনিবের অকথিত অভিপ্রায় তার কাছে স্পষ্ট। এগুলো হল "ছেলেমানুষি"। কিন্তু যখন প্রয়োজনের তাগিদে মরিয়া শ্রমিকরা কোনো নিয়ম না ভেঙে, সম্পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে ধর্মঘট করে তখন সেটাকে বলা হয় ভীষণ বিশৃঙ্খলা।

স্ফূর্তিতে মত্ত তরুণ "বাবুরা" লক্ষও করে না, পুলিশটি চুপ করে অপমান হজম করার মধ্য দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ জানাচ্ছে।

তারা লক্ষও করে না, তাদের পাশ দিয়ে যে শ্রমিকটি হেঁটে গেল, তার মুখে একটুও হাসি নেই। ওই শ্রমিকটির কাছে তারা কিন্তু স্ফূর্তির খরচ জোগাতে চাঁদাও চেয়ে বসতে পারে।

● **কার পয়সায়?** প্রতিটি শ্রমিক, প্রতিদিন অন্যের খরচ জোগাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, নানারকম কর দিতে দিতে। ছাত্ররা পড়াশোনা করছে তার পয়সায়। কিন্তু ছাত্রের দল হয় এ কথা জানে না, নয়তো জানতে চায় না।

ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে পাঠরত একজন ছাত্রের পিছনে বছরে খরচ ২,৯৮,০০০ লিরা।[৬] এর মধ্যে ৯,৮০০ লিরা দেন ছাত্রটির বাবা শিক্ষাকর হিসাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের পিছনে খরচ ৩,৬৮,০০০ লিরা। তার মধ্যে ৪৪,০০০ দেন তার বাবা।

একজন ডাক্তারের প্রশিক্ষণের সময় গরিব জনগণ তার পড়ার খরচ দিয়েছে। অঙ্কটা হল ৪৫,৮৬,০০০ লিরা। তার বাবা দিয়েছিলেন ২,৪৪,০০০ লিরা। ডাক্তারের শিক্ষা তাহলে বস্তুত গরিব মানুষের নিঃস্বার্থ দান। কিন্তু ডাক্তার

৬ঃ ইংরেজি অনুবাদকের মন্তব্য ঃ ২,৯৮,০০০ লিরা মানে প্রায় দু'শো পাউণ্ড (বর্তমান ভারতীয় বিনিময় হার অনুযায়ী প্রায় ৩,৬০০ টাকা)।

বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য ঃ এখন এই খরচ বেড়ে অন্তত তিন গুণ হয়েছে নিশ্চয়।

কী করবে? মোটা টাকা "ভিজিট" নেবে পনেরো মিনিট একজন রোগী দেখার জন্য। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করবে। গণস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য কোনো ভাল পরিকল্পনা দেখলে তার বিরোধিতা করবে।

● **সুপ্ত ফ্যাসিস্ট** ফ্লোরেন্স-এ আমার সহপাঠীরা কখনো খবরের কাগজ পড়ত না। যাও দু'একজন কাগজ পড়ত তাও পড়ত কেবল কর্তৃপক্ষের প্রচারিত পত্রিকাটা। একবার একজনকে জিগ্যেস করেছিলাম ওই কাগজটা কার টাকায় চলে। উত্তর পেয়েছিলাম, "কার টাকায় আবার! ওটা তো একটা স্বাধীন সংবাদপত্র।"

রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জানতে এদের কোনো আগ্রহ নেই। এদের মধ্যে একজন আবার "ইউনিয়ন" শব্দটার মানেই জানে না।

ধর্মঘট সম্পর্কে এদের যা বোঝানো হয়েছে শুধু সেইটাই এরা জানে। ধর্মঘট নাকি কেবল উৎপাদন ধ্বংস করার কারসাজি। কথাটা সত্যি কি না তা তলিয়ে দেখার চেষ্টাও এরা করে না।

এদের মধ্যে তিন জন পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী। আঠাশ জন রাজনীতি বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গে তিন জন ফ্যাসিবাদীকে যোগ করলে মোট দাঁড়ায় একত্রিশ জন ফ্যাসিবাদী।

● **আরো অন্ধ** কিছু ছাত্র আর বুদ্ধিজীবী আবার অন্য ধরনের। এরা অনেক কিছু পড়ে টড়ে এবং নিজেদের বলে জঙ্গি বামপন্থী। তবুও দেখি, এরা আরো অন্ধ।

আমার চেনা জঙ্গিতম বামপন্থী শিক্ষকটিকে একবার অভিভাবক ও শিক্ষকদের এক সভায় বক্তৃতা দিতে শুনেছিলাম। যখন "ডোপোস্কুওলা"-র কথা উঠল, উনি ক্ষেপে গেলেন, "আপনারা মশাই বোঝেন না, সপ্তাহে ঝাড়া আঠারো ঘণ্টা আমাকে পড়াতে হয়!"

যে শ্রোতারা এই বক্তৃতা শুনছিল তারা কারা জানেন? একদল শ্রমিক — যাদের ভোর চারটের ঘুম থেকে উঠে ৫টা ৩৯-এর ট্রেন ধরতে হয়। একদল কৃষক — যাদের প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টা কাজ করতে হয় গ্রীষ্মকালেও।

শ্রোতারা কথাও বলল না, হাসলও না। পঞ্চাশ জোড়া ভাবলেশহীন চোখ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল শিক্ষকটির দিকে।

● **তেতো ফল** এই নির্বাচন-নির্ভর ব্যবস্থার ফলটি কিন্তু তেতো। কোনোদিন পেকে মিষ্টি হবে না। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝলাম, আমার সহপাঠীদের মধ্যে বেশির ভাগই "ম্যাজিস্ট্রেল"-এ পড়তে এসেছে হয় ঘটনাচক্রে, নয়তো বাবা-মায়ের ইচ্ছা অনুসারে।

আমি যেদিন আপনাদের স্কুলের দরজায় প্রথম আসি সেদিন আমার হাতে ছিল নতুন একটা ব্রিফকেস। আমার ছোট ছোট ছাত্রদের উপহার। পনেরো বছর বয়সেই আমি শিক্ষক হিসাবে আমার প্রথম পুরস্কার পেয়ে গিয়েছিলাম।

এ সব কথা আপনাকে অথবা আমার সহপাঠীদের কখনো বলিনি। না বলে ভুল করেছিলাম হয়তো। কিন্তু আপনার স্কুল ঠিক মন খুলে কথা বলার জায়গা তো নয়! সেখানে কেউ যখন কোনো সত্যিকারের ভাল কাজ করতে চায়, অথবা পরিষ্কার বোঝে সে কী চায়, তখন তাকে বোকা মনে করা হয়।

● **কিপটে** আমার সহপাঠীরা কেউ শিক্ষকতায় আগ্রহী ছিল না। একজন বলেছিল, "আমি ব্যাঙ্কে চাকরি করতে চাই। 'টেকনিশ্'-এ বড় বেশি অঙ্ক করতে হয়, 'লাইসিও'-তে বড় বেশি ল্যাটিন। তাই আমি এখানে এসেছি।"

এইসব ছাত্রদের অবস্থা প্রসঙ্গে ১৯৬১ সালের আদমশুমারির হিসাব কী বলে দেখা যাক। "ম্যাজিস্ট্রেল" থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়েছে ৬,৭৫,৯৭৫ জন নাগরিক। যারা "ম্যাজিস্ট্রেল"-এর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে তাদের এর মধ্যে ধরা হল না। এদের মধ্যে ৬০,০০০ জন হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ২,০১,০০০ জন ওই বছর শিক্ষকতার কাজে যুক্ত ছিলেন। আরও ১,২০,০০০ জন শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। বাকি ৩,০০,০০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মোট সংখ্যার ৪৩ শতাংশ, যাঁরা আদৌ কোনোদিন শিক্ষকতা করবেন না।

● **অতৃপ্ত** আমার বেশ কয়েকজন সহপাঠী আমাকে বলেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে চায়। কী বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়বে তা ঠিক না করেই চায়।

১৯৬৩ সালে "ম্যাজিস্ট্রেল" থেকে পাশ করে বেরিয়েছিল ২২,২৬৬ জন। পরের বছর এদের মধ্যে ১৩,৩৭০ জনকে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে।

তার মানে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে এমন প্রতি একশ' জনের মধ্যে ষাট জনেরই শিক্ষকতা করার ইচ্ছা নেই।[৭]

● **নিজেকে শিক্ষক বলতে পারে কে ?** আমাদের ক্লাসে একটি মেয়েকে অন্য সকলের থেকে পৃথক মনে হ'ত। পড়াশোনার প্রতি সত্যি সত্যিই তার আগ্রহ ছিল। বহু ভাল ভাল বই পড়ত সে। ঘরে দরজা বন্ধ করে বাখ্[৮] শুনত মেয়েটি। একা একা।

আপনাদের স্কুলে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় তার শ্রেষ্ঠ ফসল এই মেয়েটি।

কিন্তু আমি দেখেছি এই আত্মোন্নতির লোভই আপনার স্কুলের সবচেয়ে মারাত্মক প্রলোভন। কোনো কিছু শেখার উদ্দেশ্য একটাই হওয়া উচিত — অন্যকে সেই অর্জিত বিদ্যা শেখানো। "নিজেকে শিক্ষক বলতে পারে কেবল সেই — যে শুধুমাত্র নিজের জন্য সংস্কৃতিচর্চা করে না।"

● **বিশেষ ধরনের স্কুল** যে ধরনের ছেলেরা আপনার ছাত্র, তাদের "শিক্ষক" কথাটার অর্থ বোঝাতে গিয়ে আপনি যে কতটা নিরুদ্যম বোধ করেন তা বুঝি। তবুও প্রশ্ন করব — ছেলেরাই আপনাকে নষ্ট করেছে, না আপনি নষ্ট করেছেন ওদের ?

এখন "ম্যাজিস্ট্রেল" থেকে পাশ করে শিক্ষকতা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সুযোগ বাড়ছে। ফলে "ম্যাজিস্ট্রেল"-এ যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাও ক্রমশ অস্পষ্ট এবং গতানুগতিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভাল শিক্ষক তৈরি করার জন্য চাই বিশেষ ধরনের স্বনির্ভর স্কুল। অন্য ক্ষেত্রে চলে যাবার পথে একটা ধাপ মাত্র হলে সে স্কুল কোনো কাজে লাগবে না। যে ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরি করতে চায় সে যেন ওই স্কুলে নিজেকে একেবারেই খাপ খাওয়াতে না পারে। কিন্তু কৃষক ঘরের যে ছেলেটি শিক্ষক হতে চেয়ে এসেছে সে যেন ওই স্কুলকে খুবই আপনার বলে মনে করতে পারে।

● **এক ধরনের বাছাই আবার প্রয়োজনও** এবারে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা কিন্তু বাধ্যতামূলক আট বছরের স্কুলের সমস্যা থেকে ভিন্ন।

৭ঃ ইটালির শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যানের সালতামামি, ১৯৬৫।

৮ঃ বাখ্ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ।

ওখানে সমান হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের পবিত্র অধিকার। কিন্তু "ম্যাজিস্ট্রেল"-এ সব কিছু যোগ্যতা অনুসারে — কঠোরভাবে।

কেবল সেই নাগরিকরাই এই স্কুলগুলোতে পড়তে আসবে যারা অপরের সেবা করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চায়। এদের যোগ্যতা ও শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে হবে প্রথমেই।

শিক্ষক হওয়ার ডিপ্লোমা পাওয়া যেন খুব কঠিন হয়। পরে যেন আমাদের তাচ্ছিল্য করা না হয়। কেমিস্ট, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার — শিক্ষকদেরও এদের সমান হিসাবে দেখতে হবে।

● **লক্ষের দিকে চোখ রাখুন** একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার অঙ্ক না জানতেই পারে। একজন ডাক্তার যদি কবিতা বিশেষ না বোঝেন তাতে ক্ষতি কী? এজন্য কি এদের আপনি পরীক্ষায় ফেল করাবেন?

আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন, ঠিক এই ভাষায় বলেছিলেন, "দেখো, তুমি যথেষ্ট ল্যাটিন জান না। তুমি টেকনিক্যাল স্কুলে যাও।" ভাল শিক্ষক হতে হলে ল্যাটিন না জানলেই চলবে না — এ কথা আপনি স্থির জানেন? এ নিয়ে ভেবেছেন কখনো? চালু ব্যবস্থাটার দিকে সব সময় আপনার সজাগ দৃষ্টি। কখনো তার মূল্যায়ন তো কই করেন না!

● **ব্যক্তি** আমাকে নিয়ে যদি সত্যিই ভাবতেন আপনি, যদি সত্যিই জানতে চাইতেন আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, কোথায় পৌঁছতে চাই, তাহলে ল্যাটিন সম্পর্কে আপনার ভাবনা অনেকটা কমে যেত।

তবে, আমার মধ্যে আপনি আপত্তিকর অন্য কিছু খুঁজে বার করেছেন সম্ভবত। আসলে আপনি ভয় পান। যখন দেখেন একজন পনেরো বছর বয়সের ছেলে তার জীবনের লক্ষ সম্পর্কে পুরো সচেতন, তখন আপনি ভয় পেয়ে যান। ছেলেটি যে শিক্ষকের[৯] কাছে এর আগে পড়াশোনা করে এসেছে তার প্রভাব চোখে পড়ে যায় আপনার।

ব্যক্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করা আপনার চোখে মহা অপরাধ। ওদিকে "ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশ" নাকি আপনার মহান লক্ষ। সামাজিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আপনি একটুও ভাবিত নন।

৯ঃ বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য ঃ এখানে শিক্ষক বলতে ফাদার মিলানির কথা বলা হচ্ছে।

আমার উপরে আমার শিক্ষকের প্রভাব আছে। তা নিয়ে আমি গর্বিত। আমার শিক্ষকও এজন্য গর্ব বোধ করেন। স্কুলে শিক্ষার আসল কথা তো এই!

মানুষ আর পশুর মধ্যে তফাৎ তো এখানেই। শিক্ষক নিজে যা কিছু বিশ্বাস করেন, ভালবাসেন, যা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবই তিনি তাঁর ছাত্রের মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ছেলেটি বড় হতে হতে, তার সাথে যোগ করবে তার নিজস্ব অবদান। এইভাবেই তো মানবজাতি এগিয়ে চলে।

পশু-পক্ষীরা স্কুলে যায় না। নিজেদের "ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশ"-এর সূত্র ধরে চড়াই পাখিরা যুগে যুগে হুবহু এক রকম বাসা বানিয়ে এসেছে।

● **সেমিনারি**[১০] শুনেছি "সেমিনারি"-তেও নাকি ছেলেরা জীবনের ব্রত নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। যদি প্রাথমিক স্কুলেই তাদের বলে দেওয়া হ'ত আমাদের সকলেরই ব্রত হল সর্বত্র শুধু মানুষের উপকার করা, তাহলে তারা কেবল নিজেদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো নষ্ট করত না।

● **সমাজ সেবার স্কুল** শেষ পর্যন্ত জীবনে আমি কী ব্রত গ্রহণ করব তা নিয়ে ভাবার অবকাশ আরেকটু বাড়তি পাওয়া যেত, যদি দু'ধরনের স্কুল থাকত।

এক ধরনের স্কুলের নাম হতে পারত "সমাজ সেবার স্কুল" — চোদ্দ থেকে আঠারো বছরের ছাত্রদের জন্য। যারা ঠিকই করে রেখেছে যে তারা অন্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করবে, কেবল তাদের জন্য এই স্কুল। এই এক স্কুলেই ধর্মযাজক, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, ইউনিয়নের কর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মী সকলে একত্রে পড়তে পারত। একটা বছর না হয় বেশি লাগত বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য।

অন্য স্কুলগুলোকে বলা যেত "ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"। আমাদের সমসাময়িক স্কুলগুলোকে একটুও রদবদল না করেই এই শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া যেত দিব্যি।

● **মহান লক্ষ** সমাজ সেবার স্কুলের লক্ষ হতে পারত অনেক উঁচু।

---

১০ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : "সেমিনারি" হল ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার স্কুল, যেখানে ভবিষ্যৎ ধর্মযাজকদের প্রশিক্ষণ চলে।

তাই হ'ত আনন্দের উৎস। পরীক্ষার ফলাফল নেই, নম্বর নেই, খেলাধুলো নেই, ছুটি নেই, বিয়ে-থা বা কর্মজীবনের উন্নতি নিয়ে ভাবনাচিন্তার বালাই নেই। সমস্ত ছাত্রকেই সমস্ত মন-প্রাণ একই দিকে উৎসর্গ করতে শেখানো যেত।

সকলেই মহান লক্ষে হয়তো পৌঁছতে পারত না। প্রেমেট্রেমে পড়ে কেউ কেউ হয়তো ছোটখাট পারিবারিক বৃত্তে তার ভালবাসাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলত।

কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো মানবজাতি নামক সুবিশাল পরিবারটির সেবা করতে শেখার ফলে তাদের হৃদয় হ'ত অনেক প্রসারিত। সার্থকতর আদর্শবাদী পিতামাতা হতে পারত তারা। সন্তানদের তারা আবার সেই স্কুলে ছাত্র হতে পাঠাত।

"ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"গুলো কী করে? সকলকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। যারা বিয়ে করল, তাদের জীবন খুব যে সাফল্যমণ্ডিত হয় তা নয়। আর যারা বিয়ে করে না, তারা খিট্‌খিটে আইবুড়ো ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

● **বেকার শিক্ষক** প্রায়ই অভিযোগ শুনি শিক্ষকদের সংখ্যা বড্ড বেশি। কথাটা একেবারেই সত্যি নয়। এমন অনেক লোক শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে নেয় যারা আদৌ এ কাজ পছন্দ করে না। কাজের সময় বাড়িয়ে দিলে এদের মধ্যে অনেকেই কেটে পড়বে।

একজন বিবাহিতা শিক্ষিকা তার স্বামীর সমান টাকা রোজগার করেন। একজন সাধারণ গৃহিণী যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন এই শিক্ষিকা ঠিক ততক্ষণই বাড়িতে থাকতে পারেন। আদর্শ বৌ, আদর্শ মা। বাচ্চার সর্দি হয়েছে? ওই শিক্ষিকা মা ঠিক বাড়িতে আছেন। এমন একজন মহিলাকে কে না চাইবে বৌ হিসাবে?

এছাড়া, ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে গিয়ে দেখুন — হাজার হাজার পদ খালি পড়ে রয়েছে। যাকে পাওয়া যাচ্ছে তাকে দিয়েই এই খালি জায়গাগুলো পূরণ করা হচ্ছে। একটা উচু ডিগ্রি থাকলেই হল, অথবা ডিগ্রির জন্য পড়ছে এমন কেউ হলেও চলবে। রসায়নবিদ, পশুচিকিৎসক, ছাত্রনামধারী কোনো ব্যক্তি — যেই হোক।

অথচ বহু বছর ধরে পড়ানোর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকদের আপনারা এই পদগুলোতে নেবেন না।

● **জাতিভেদ প্রথা** বর্তমানে যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁরা কোনোদিন "ম্যাজিস্ট্রেল" থেকে পাশ করা শিক্ষকদের ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলে পড়াতে দেবেন না।

উপরন্তু অনেকে বলছেন, প্রাথমিক স্কুলে পড়াতে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকা আবশ্যিক হওয়া উচিত। তাঁরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনোবিদ্যা চর্চা করে এলে তবেই সার্থক শিক্ষক হওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা যখন স্কুলব্যবস্থার সমালোচনা করেন, তখন তাঁরা ভুলে যান যে, ওই ব্যবস্থাই তাঁদের জন্ম দিয়েছে। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ওই ব্যবস্থার বিষ তাঁদের শরীরে ঢুকেছে। তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন না যে, অন্য কোনো পারিপার্শ্বিক থেকে আগত মানুষের মধ্যেও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

প্রাথমিক স্কুলের যে শিক্ষকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়ান, তাঁদের তাঁরা ঘরের লোক মনে করেন। পরস্পরের কাছে কিছু গোপন করেন না। একসাথে কাজ করেন তাঁরা।

কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের শিক্ষকের সাথে তাঁরা কথা বলেন মেপে মেপে, যেন শত্রুর সাথে কথা বলছেন।

স্বীকার না করলেও, সত্যি কথাটা তাঁরা ঠিক জানেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা অনেক বেশি দক্ষ, কারণ তাঁরা নিজেরা বেশি দিন স্কুলে কাটাননি। উচ্চতর স্কুলগুলোর শিক্ষকদের হাল খারাপ কারণ তাঁদের গুচ্ছের ডিগ্রি আছে।

যে সংস্কৃতি সকলের প্রয়োজন

● **অচ্ছ্যুৎ** পাহাড়ি অঞ্চলে বাঁচা মুশকিল। ক্ষেতে-খামারে আমাদের সংখ্যা ভীষণ বেশি। এ বিষয়ে সব অর্থনীতিবিদ একমত।

আর একমত না হলেই বা কি? একবার আমাদের দিক থেকে ভাবুন না! আপনার ছেলেকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিলে কেমন লাগত আপনার? কাজেই আপনার উচিত আপনাদের চৌহদ্দিতে আমাদের সাদরে ঢুকতে দেওয়া। সমান অধিকার নিয়ে, কেবল ফালতু কাজ করার উপযোগী দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে নয়।

সমস্ত সম্প্রদায়েরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। কারো সংস্কৃতিই অপরের তুলনায় খাটো নয়। আমাদের সংস্কৃতি আমরা আপনাদের উপহার দেব। পুঁথিপড়া পণ্ডিতদের লেখা আপনাদের ওই বইগুলোর রসহীনতাকে দূর করে দেবে এক ঝলক টাটকা বাতাস।

● **গ্রামীণ সংস্কৃতি** স্কুলের একটা পাঠ্যপুস্তক খুলে দেখেছি। তাতে রয়েছে গাছপালা, পশু-পক্ষী, ঋতুচক্রের কথা। মনে হতে পারে একজন কৃষকের লেখা বই।

কিন্তু না। লেখকরা আপনাদের স্কুলেরই সৃষ্ট। ছবিগুলো দেখলে স্পষ্ট হয় ব্যাপারটা। ন্যাটা কৃষক, গোলাকার বেলচা, বাঁকা নিড়ানি, কামারদের হাতে আদ্যিকালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বটগাছে অশ্বত্থ পাতা।

আমার প্রথম বর্ষের দিদিমণি একদিন সম্পূর্ণ অন্য একটা গাছ দেখিয়ে বললেন, "ওই গাছে উঠে কতগুলো চেরি পেড়ে দাও তো!" কথাটা শুনে মা বললেন, "মহিলাকে মাষ্টারনী হতে কে অনুমতি দিল?"

আপনি ওকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমাকে আপনি পড়াতে দেবেন না। অথচ আমি সব ক'টা গাছের নাম জানি।

আমি সব লতাপাতা চিনি। আমি গাছ কেটেছি, শাকপাতা তুলে এনেছি, রেঁধে খেয়েছি। পরীক্ষার খাতায় একটা লতার নাম লিখেছিলাম — চলতি নামটা। ভুল হয়েছে বলে আপনি কেটে দিয়েছিলেন। গোপনে পরে অভিধান খুঁজে মানেটা বার করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নিজেই।

● **একা থাকেন** আপনি মানুষ চেনেন আমার চেয়ে অনেক কম। আপনি লিফ্‌টে চড়ে উপর তলায় ওঠেন বাড়ির অন্য সব বাসিন্দাদের তাচ্ছিল্য করতে। প্রাইভেট গাড়িতে চড়েন বাসের যাত্রীদের দিকে নাক উঁচু করে তাকাতে। টেলিফোনে কথা বলেন যাতে লোকের মুখ না দেখতে হয় বা কারো বাড়ি না যেতে হয়।

আপনার কথা বলতে পারব না, তবে আপনার যে ছাত্ররা সিসেরো[১১] কণ্ঠস্থ করেছে, তারা ক'টা জীবন্ত মানুষের পরিবারকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে? ক'টা বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকেছে তারা? ক'জন অসুস্থ প্রতিবেশীর শিয়রে বসে রাত জেগেছে? ক'টা মৃতদেহ কাঁধে বয়ে নিয়ে গেছে শেষকৃত্য করতে? বিপদে পড়লে ক'জনের নিশ্চিত সাহায্য পাবে তারা?

১১ঃ সিসেরো ঃ ল্যাটিন ভাষায় একজন বিখ্যাত লেখক।

বাড়ির একতলার পরিবারে ক'জন লোক তা তারা জানতই না কোনোদিন, যদি না সেবার ফ্লোরেন্সে বন্যা হ'ত।

এইসব ছেলেমেয়েদের সাথে এক বছর এক ক্লাসে পড়েছি আমি। ওদের পরিবারগুলো কেমন তা জানতেও পারিনি। অথচ ওদের বক্‌বকানি প্রায় থামতই না। এক এক সময় ওরা এমন চিল্লাত যে, ওদের কথা কিছু বোঝাই যেত না। অবশ্য ওরা নিজেদের গলার আওয়াজ শুনতে নিজেরা এত ভালবাসে যে, অন্যে কথা বুঝল কি না তা নিয়ে একটুও মাথাব্যথা নেই ওদের।

● **মানবিক সংস্কৃতি** রোজ আপনার জানালার নিচ দিয়ে হাজারখানেক মোটরগাড়ি দৌড়ায়। গাড়িগুলো কার, কোথায় যাচ্ছে, তা আপনি জানেন না।

আর আমি যে উপত্যকায় থাকি সেখানে মাইলের পর মাইল জোড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতিটি শব্দ আমার চেনা। দূরে যখন একটা গাড়ির আওয়াজ শুনি তখন বুঝতে পারি নেভিও স্টেশনের দিকে চলেছে। দেরি করে ফেলেছে বেরোতে। শুনতে চাইলে শত শত লোকের কথা, ডজন ডজন পরিবার, তাদের আত্মীয়স্বজন আর ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে অনেক কথা জানাতে পারি আপনাকে।

একজন শ্রমিকের সাথে যখন কথা বলেন, তখন প্রায় সব কিছু ভুলভাল বলতে থাকেন আপনি। কী কথা বলতে হবে বোঝেন না, কী ধরনের বাচন-ভঙ্গি হবে বোঝেন না, রসিকতাগুলো পর্যন্ত বেমানান হয় আপনার। এদিকে একজন পাহাড়ি লোক কী ভাবছে ঠিক বলে দিতে পারি আমি, সে যদি মুখ না খোলে তবুও। যখন সে কোনো কথা বলে, তখন সে আসলে কী ভাবছে তা বলে দিতে পারি আমি।

আপনাদের কবিরা এই সংস্কৃতি আপনাদের শেখায়নি। অথচ উচিত ছিল তাই। পৃথিবীর নব্বই ভাগ লোকের সংস্কৃতির চেহারা কিন্তু এই। অথচ কেউ আজও পর্যন্ত একে কথায় বা ছবিতে বা চলচ্চিত্রে রূপ দিতে পারেনি।

অন্তত একটু বিনয়ী হতে শিখুন। আপনাদের সংস্কৃতিতে আমাদের সংস্কৃতির মতোই অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। হয়তো তুলনায় আরো বেশিই আছে। প্রাথমিক স্কুলে যিনি শিক্ষকতা করবেন তাঁর পক্ষে আপনাদের সংস্কৃতি কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতিকর।

যে সংস্কৃতি আমাদের কাছে আপনি দাবি করেন

● **ল্যাটিন** যে বিষয়টির উপরে আপনি সবচেয়ে জোর দেন, সে বিষয়টি কোনোদিনই আমাদের পড়াতে হবে না।

আপনি আমাদের দিয়ে ইটালিয় ভাষার তর্জমা করান ল্যাটিনে। কিন্তু এই দুই ভাষার মধ্যেকার সীমারেখা কি খুব স্পষ্ট?

কে যেন একজন আপনার জন্য একটা ল্যাটিন ব্যাকরণ লিখে ফেলেছেন। ধাপ্পাবাজির একটি চমৎকার উদাহরণ! কোনো নিয়মের কথা বলতে গেলে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হয়, নিয়মটা কোত্থেকে এসেছে, কবে এসেছে। লেখক ভদ্রলোক জানেন তা?

যারা ঝামেলায় যেতে চায় না তারা ব্যাকরণের আধিপত্য মেনে নিয়ে সব ক'টা নিয়ম মুখস্থ করে ফেলে। পরের ক্লাসে পাশ করে ওঠাই হল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। পরে নিজেরা যখন শিক্ষক হবে, তখন এই একই খেলা খেলবে তারা। ছাত্রদের শেখাবে, নিয়ম মানো, নয়তো ফেল করো।

সোজা জিনিস সহজ করে বলাটা আপনাদের কাছে অপরাধের সামিল। অথচ আপনাদের নমস্য প্রাচীন ব্যক্তিরাও কিন্তু সহজ করে কথা বলা পছন্দই করতেন।

● **অঙ্ক** "ম্যাজিস্ট্রেল"-এ আরেকটি বিষয় খারাপ পড়ানো হয়। বিষয়টি হল অঙ্ক। প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াতে গেলে প্রাথমিক ধাপের অঙ্ক জানলেই চলে। তিন বছর ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে শেখা অঙ্কটা নিতান্তই বাড়তি পাওয়া। সত্যি কথা বলতে কি, "ম্যাজিস্ট্রেল"-এর পাঠক্রমে অঙ্ক আদৌ না থাকলে চলে। বরং অঙ্ক শেখানোর সবচেয়ে ভাল পথ কী সেটা শেখানো দরকার। অঙ্ক শেখা আর শেখানোর পদ্ধতি রপ্ত করা কিন্তু এক ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারটা পড়ে শিক্ষাতত্ত্বের আওতায়।

আমাদের সাধারণ সংস্কৃতির একটা দিক হিসাবে উচ্চতর গণিত সম্পর্কে কিছু শেখানো অবশ্য ভাল। দু'চার কথায় পুরো জিনিসটা বোঝাতে পারবেন এমন কোনো একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে তাঁকে দিয়ে দু'টো কি তিনটে বক্তৃতা দেওয়ালেই যথেষ্ট হবে।

"ম্যাজিস্ট্রেল" থেকে পাশ করা ছাত্রদের যদি ইন্টারমিডিয়েট স্কুলে ভবিষ্যতে পড়াতে দেওয়া হয়, তাতেও সমস্যাটা বিশেষ পাল্টাবে না।

আসলে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায়ে পড়াবার জন্য অঙ্কে একটা ডিগ্রি থাকার কোনো দরকারই হয় না। এই দরকার যে আছে তা সকলকে বুঝিয়েছে কেবল বিশেষ এক শ্রেণীর লোক যাদের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী পুত্র-কন্যা আছে। ফলে তারা খুব লোভনীয় ২০,৪৭৮টি চাকরি পকেটস্থ করতে পারে। কাজের চাপ কম সে সব চাকরিতে, সব সময়ে তটস্থ হয়েও থাকতে হয় না। ইণ্টারমিডিয়েটের তৃতীয় শ্রেণীর যে কোনো ছাত্র যা ইতিমধ্যেই শিখে ফেলেছে, বছরের পর বছর, বারে বারে, তার পুনরুক্তি করে যাওয়া চলে এই চাকরি করলে। এ চাকরিতে ছাত্রদের খাতা দেখে দিতে সময় লাগে মাত্র পনেরো মিনিট, কারণ উত্তরগুলো হয় ঠিক, নয়তো ভুল।

● **দর্শনশাস্ত্র** পাঠ্যপুস্তক পড়ে কোনো দার্শনিকের চিন্তা শেখা একটা মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। দার্শনিকের সংখ্যা অগুণতি আর তারা বলেছেও হাজার রকম কথা।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন যিনি, তিনি কোনোদিন কোনো একজন দার্শনিকের পক্ষ নেননি, বিপক্ষেও কিছু বলেননি। আমি বুঝেই উঠতে পারতাম না, উনি কি সব ক'জন দার্শনিককেই পছন্দ করেন, না কি এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন!

ধরুন, আমার সামনে আছেন দু'জন শিক্ষক — একজন পুরো উদাসীন, অন্যজন দর্শন নিয়ে পাগল যাঁর নিজের একটা বিশ্বাস আছে, অথবা একজন বিশেষ দার্শনিককে যিনি পছন্দ করেন। আমি কিন্তু ওই পাগলটিকেই বেছে নেব। কারণ তিনি ওই বিশেষ দার্শনিক সম্পর্কে অনেক কিছু বলবেন এবং অন্যদের আক্রমণ করবেন। আমাদের তিন বছর মেয়াদের মধ্যেই ওই দার্শনিকের মৌলিক রচনাগুলি আমাদের চেপে ধরে পড়াবেন। ফলে আমরা বুঝতে পারব দর্শন কেবল পুঁথিগত ব্যাপার নয়, দর্শন নিয়ে সারা জীবন কাটানো যায়।

● **শিক্ষাতত্ত্ব** যেভাবে আজকাল শিক্ষাতত্ত্ব পড়ানো হয় তাতে ওই বস্তুটি না পড়লেও চলে। তবে এ বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। বিষয়টির কিছুটা গভীরে ঢুকতে পারলে বোঝা যেত পড়া দরকার কিনা।

হয়তো আবিষ্কার করতাম শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা একটাই। হয়তো শিক্ষাতত্ত্ব বলে, প্রত্যেকটি ছেলে অন্যদের থেকে আলাদা। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত অন্য মুহূর্তগুলি থেকে আলাদা। প্রত্যেকটি ছেলে,

প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য প্রতিটি মুহূর্তের অর্থ স্বতন্ত্র।

পাঠ্যপুস্তকটির আধপাতা ব্যবহার করেই এ কথা ব্যাখ্যা করা যায়। বইটার বাকি অংশ ছিঁড়ে ফেলে দিলেও কিছু যায় আসে না।

বারবিয়ানা স্কুলে প্রতিদিনই একটা না একটা শিক্ষাতাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দিত। তবে আমরা সে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতাম অন্য সব নামে। আমরা এক একটা ছেলের নামে নাম দিতাম এক একটা সমস্যার। প্রত্যেক বার, প্রতিটি ক্ষেত্রে।

কোনো প্রফেসর সাহেবের কোনো জ্ঞানগর্ভ বই পড়ে জিয়ানী সম্পর্কে আমরা নতুন কিছু জানতে বা শিখতে পারব তা আদৌ মনে হয় না।

● **বাইবেল-এর সুসমাচার**[১২] প্রাচীন কতগুলি কাব্যগ্রন্থের (ইলিয়াড, অডিসি, এনিয়াড) বাজে অনুবাদ পড়েছি তিন বছর ধরে। তিন বছর গেছে দান্তের পিছনে। বাইবেল-এর সুসমাচার একটুও পড়ানো হয়নি।

সুসমাচার কেবল পাদ্রিদের ব্যাপার এমন দাবি করবেন না দয়া করে। প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক বছর এই বইটি পড়ানো উচিত। ধর্মীয় দিকটা যদি নাও ভাবি, এ কথা একশ'বার সত্যি যে, সমস্ত স্কুলে এই বইটি অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

সমস্ত সীমান্তের ভেদাভেদ অতিক্রম করে যে বইটি মানুষের মনে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করেছে সেই বইটি পড়ার জন্য সাহিত্য পাঠক্রমে সবচেয়ে বেশি সময় দেওয়া উচিত।

ভূগোল পাঠক্রমে দীর্ঘতম পরিচ্ছেদটির বিষয় হওয়া উচিত প্যালেস্টাইন। ইতিহাসের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বর্ণিত হওয়া উচিত ঈশ্বরপুত্র যীশুর সমসাময়িক ঘটনাবলি এবং তাঁর জন্মের আগের এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরের ঘটনাবলি।

সাধারণ পাঠক্রমে আরও একটি বিশেষ বিষয়বস্তু যুক্ত হওয়া উচিত। অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত ওল্ড টেস্টামেণ্ট (Old Testament), সুসমাচারের বিশেষ সংস্করণ (Synoptic Gospels), বাইবেলের ভাষাগত

---

১২ : বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য : বাইবেল-এর দ্বিতীয় ভাগে (New Testament) যীশুখ্রীষ্টের চার জন শিষ্য — জন, লুক, ম্যাথু ও পিটার — যীশুর জীবন ও বাণীসমূহের বর্ণনা করেছেন। সেই চারটি বর্ণনাকেই বলা হয় "সুসমাচার"।

সমালোচনা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত ভাষাতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক সমস্যাবলি।[১৩]

এ কথা আপনি কোনোদিন ভাবেননি। কেন বলুন তো? যাঁরা আপনার ওই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা বোধহয় যীশুকে খুব একটা বিশ্বাস করেন না। গরিবের বড় বেশি আপনার জন ছিলেন তিনি, বিত্তবানের সুহৃদ হওয়ার পক্ষে বড় বেশি নিঃস্ব — তাই না?

● **ধর্ম** যদি সুসমাচার অধ্যয়ন যথাযোগ্য মর্যাদা পায়, তবেই ধর্ম শিক্ষার প্রতি আপনারা সত্যি সত্যি মন দিতে পারবেন।

বাইবেল-এর কথাগুলো ঠিকমতো পড়িয়ে গেলেই ছেলেমেয়েরা ধর্মের মূল কথা শিখে যাবে। যে কোনো পাদ্রি শেখাতে পারবেন। তাঁকে সাহায্য করতে সঙ্গে যদি এমন একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক থাকেন যিনি পুরোপুরি নাস্তিকও নন আবার আস্তিকও নন — তাহলে খুব ভাল হয়। অবশ্য ওই পাদ্রির মতোই সুসমাচারের প্রতিটি শব্দ তাঁরও জানা থাকতে হবে।

এমন শিক্ষক খুঁজতে গেলেই আপনার সংস্কৃতির কোথায় খামতি তা দেখতে পাবেন। ফ্লোরেন্স-এ অন্তত কয়েক ডজন পাদ্রি আছেন যাঁরা খুব উচ্চ পর্যায়ে বাইবেল পড়াতে পারেন, যাঁরা অতি সহজে গ্রিক ভাষায় বাইবেল পড়তে পারেন এবং প্রয়োজন হলে হিব্রু[১৪] বাইবেল-এর বেশ খানিকটা বুঝে নিতে পারেন।

এঁদের সাথে আলোচনায় বসতে পারেন এমন একজন লোকের নাম করতে পারবেন আপনি? আপনাদের স্কুল থেকে পাশ করা কোনো ব্যক্তিকে চাই, ধর্মশাস্ত্র প্রশিক্ষণ স্কুলের কেউ হলে চলবে না।

একটি বই ছাড়া পৃথিবীর তাবৎ বই পড়েছেন এমন একজন তরুণ বুদ্ধিজীবীকে বক্তৃতায় বলতে শুনছিলাম, "জিদ্ বলেছেন, মাটিতে পড়ে গমের দানার মৃত্যু হয় বলেই সে বীজে পরিণত হয়। তা না হলে বীজ ফলপ্রসূ হয় না।"

১৩: Synoptic Gospels: বাইবেল-এর একটি বিশেষ সংস্করণ যেখানে চারটি সুসমাচার একের পর এক না ছাপিয়ে পাশাপাশি ছাপানো হয় মিলিয়ে নেবার সুবিধের জন্য। ভাষাগত সমালোচনা: সুসমাচার চারটির প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলিতে ভাষাগত পার্থক্যের অধ্যয়ন।

১৪: বাইবেল-এর প্রাচীনতম অংশ হিব্রু ভাষায় লেখা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ রচিত গ্রিক ভাষায়।

দেখুন, বলতে পারব না এই জিদ্[১৫] ভদ্রলোকটি কে, তবে বাইবেল-এর সুসমাচার আমি বহু বছর ধরে পড়ছি এবং সারাজীবন ধরেই আমি তা অধ্যয়ন করব।

● কাউন্ট মহোদয়[১৬] যারা যীশুখ্রীষ্টের বাণী ভুলে গেছে তারা না পারে এমন খারাপ কাজ নেই। প্রথম থেকেই তাদের সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। কী পড়ানো হবে তা ঠিক করে দিয়েছে কে, এ প্রশ্ন মনে উঁকি দিতে থাকে তখন।

আসলে জন্ম থেকেই আপনাদের স্কুল নানা সমস্যায় পড়েছে।

১৮৫৯ সালে আপনাদের স্কুল জন্মেছে। এক রাজা ঠিক করলেন তাঁর পরিবারের সম্পত্তি বাড়াতে হবে। কাজেই শুরু হল যুদ্ধের প্রস্তুতি। প্রথমেই তিনি এক সেনাপতিকে সরকারের কর্ণধার করে দিলেন।

তারপর লোকসভাকে দিয়ে দিলেন ছুটি। শেষকালে এক কাউন্টকে ডেকে আদেশ করলেন রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটা আইন প্রণয়ন করতে।[১৭]

১৫ঃ জিদ্ঃ অভিধান ঘেঁটে দেখলাম আঁদ্রে জিদ্ একজন ফরাসি লেখক। তাঁর কোনো বইতে বাইবেল থেকে কথাটা তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন আর অধ্যাপক মশাই ধরে নিয়েছেন কথাটা জিদ্ নিজেই লিখেছেন।

১৬ঃ বাংলা অনুবাদকের টীকাঃ বিদেশে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন খেতাব থাকে। "কাউন্ট" সেইরকম একটা খেতাব।

১৭ঃ এক রাজাঃ দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল।
এক সেনাপতিঃ অ্যালফন্সো লা মারমোরা।
লোকসভার ছুটিঃ যুদ্ধের সময় লোকসভা ভেঙে দিয়ে ভিক্টর ইমানুয়েল নিজের হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছিলেন।
একজন কাউন্টঃ গ্যাব্রিও কাসাটি। ১৮৫৯ সালে কাসাটি আইন চালু হয়। পিডমন্টীয় লোকসভা বা পরবর্তী ইটালিয় লোকসভা কেউই এই আইন অনুমোদন করেনি।
বাংলা অনুবাদকের মন্তব্যঃ ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনার পুরোভাগে ছিলেন অধুনা লোকসভার সদস্য অবসরপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান এক চলচ্চিত্রাভিনেতা যিনি বক্তব্য পেশ করার শুরুতে স্বীকার করে

সমস্ত ইটালিতে গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া সেই আইনই আজকের স্কুলের ভিত্তি।[১৮]

● **ইতিহাস** এই আইনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইতিহাস অধ্যয়ন।

পৃথক পৃথক অনেকগুলো ইতিহাসের কেতাব পাওয়া যায়। তার মধ্যে যেগুলো বহুল ব্যবহৃত সেগুলো কত লোক পড়ে এবং সেগুলো সম্পর্কে কী ভাবে তা জানতে পারলে ভাল হ'ত।

সাধারণভাবে এগুলোকে ইতিহাস বলাই যায় না। বিজেতা রাজা বাদশাহের দ্বারা কৃষকদের জন্য প্রচারিত কতগুলো একপেশে, সংকীর্ণমনা গল্পের সমষ্টিকে বলা হয় ইতিহাস। ইটালিকে দেখানো হয় পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে। যারা হেরে গেছে তারা সব খারাপ। আর যারা জিতে গেছে তারা সকলেই মহৎ। কেবল রাজা-রাজড়া, সেনাপতি আর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কতগুলো নির্বোধ যুদ্ধের বর্ণনা! মেহনতি মানুষের দুঃখ-কষ্ট আর সংগ্রামের কথা হয় চেপে যাওয়া হয় অথবা অবহেলা করা হয়।

সেনাপতি আর অস্ত্রব্যবসায়ীরা যাদের অপছন্দ করে তারা ইতিহাস থেকে একদম বাদ। সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে "আধুনিক" ইতিহাস বইতে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কথা বলা আছে খুবই কম। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্মপদ্ধতির কথা তো আদপেই নেই!

● **পৌরবিজ্ঞান** পৌরবিজ্ঞান বিষয়টি আমার বেশ পরিচিত। কিন্তু আপনাদের স্কুলে বিষয়টি পড়ানো হয় না।

অছিলা হিসাবে কোনো কোনো শিক্ষক বলেন পরোক্ষ অন্য অন্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে পৌরবিজ্ঞান পড়িয়ে দেওয়া হয়। কথাটা সত্যি হলে খুবই ভাল হ'ত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান যদি এতই ভাল, তাহলে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে একই উপায় অবলম্বন করলেই তো হয়! সব ক'টা বিষয় মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কাঠামো দাঁড় করান। সব কিছু মিশে থাকবে, আবার দরকার হলে আলাদা আলাদা করেও হৃদয়ঙ্গম করা যাবে যে কোনো সময়ে।

নিয়েছিলেন যে, তিনি শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ৬ই আগস্ট, ১৯৮৬ তারিখের "দ্য স্টেটসম্যান" পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

১৮: নানাবিধ সংস্কার সত্ত্বে এবং স্কুলগুলোকে খানিকটা ঢেলে সাজানো হলেও বর্তমান স্কুলব্যবস্থার সাথে কাসাটি আইন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

অজুহাত না দেখিয়ে স্বীকার করে নিন, পৌরবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই আপনি জানেন না। "মেয়র" কথাটার অর্থ কী সে বিষয়ে আপনার প্রায় কোনো ধারণাই নেই। কোনোদিন কোনো শ্রমিকের বাড়িতে আহার করেননি আপনি। শহরের পরিবহন ব্যবস্থায় যে সব সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে সে সব বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা নেই। রাস্তার যানজট আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কী কী অসুবিধার সৃষ্টি করছে আপনার চোখ কেবল সেদিকেই।

এসব সমস্যা তলিয়ে দেখতে আপনি ভয় পান। একইভাবে ভূগোল পড়ার সময় বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে আপনি আতঙ্কিত বোধ করেন। আপনার পাঠ্যপুস্তকটি সারা পৃথিবীর কথা বলে, কিন্তু ক্ষুধা, একচেটিয়া কারবার, রাজনৈতিক ব্যবস্থা অথবা জাতি বিদ্বেষ প্রসঙ্গে নিশ্চুপ থাকে।

● **মন্তব্য** যে জিনিসটি আপনাদের পাঠক্রম থেকে সম্পূর্ণ বাদ, সেটি হল সঠিকভাবে রচনার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের পদ্ধতি।

ছাত্রদের রচনা খাতায় আপনারা যে সব মন্তব্য লিখে দেন সেগুলো দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। সেরকম চমৎকার কয়েকটা মন্তব্য — এই তো, আমার কাছেই রয়েছে। কেবল কতগুলি কাটাকাটা কথা, রচনাগুলোকে উন্নত করে তোলার জন্য কোনো পরামর্শ নয় —

"শিশুসুলভ। ছেলেমানুষি। অপরিণত। দুর্বল। নিকৃষ্ট।" এ কথাগুলো শুনে ছাত্রটির কী লাভ হবে? ছেলেটির কাছে কতটা দক্ষতা আশা করেন? ও কী ওর দাদুর মতো পরিণত বুদ্ধি হবে? তাহলে তো দাদু ভদ্রলোককেই স্কুলে পাঠাতে হয়!

অন্য কিছু মন্তব্য — "বিষয়বস্তু কম। ধারণা দুর্বল। বোধ কম। যা লিখেছ তার সাথে মানসিক সাযুজ্য সামান্য।" যে বিষয়ে লিখতে দিয়েছেন সেটাই তাহলে সুনির্বাচিত হয়নি। কেন লিখতে দিলেন?

আরও কয়েকটা মন্তব্য। "রচনাবিন্যাস উন্নততর করতে চেষ্টা করো। রচনাশৈলী ভুল। প্রকাশভঙ্গি অত্যধিক সীমিত। অস্বচ্ছ। বাক্য সংস্থাপন ঠিক হয়নি। শব্দ ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ। সহজ করে লিখতে হবে। বাক্য গঠন বেঠিক। ভাবপ্রকাশের ভঙ্গি সব সময় সুন্দর নয়। ভাবপ্রকাশের মাধ্যমের উপর আরও দখল প্রয়োজন।" এসব কী করে করতে হবে সেটা আপনার শেখাবার কথা। কিন্তু কাউকে যে ভাল লিখতে শেখানো যায়, তা আপনি বিশ্বাসই করেন না। লেখায় সঠিক ভাষা ব্যবহারের বাস্তবসম্মত নিয়ম আছে — তা আপনি স্বীকার করেন না। আপনি এখনো ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যের ধ্যান-ধারণায় ডুবে আছেন।

তারপরেই আমাদের চোখে পড়ে যায় একজন ছাত্র, যে ভগবানের আশীর্বাদপুষ্ট। তার খাতায় মন্তব্য — "স্বতঃস্ফূর্ত। চিন্তার অপূর্ব প্রকাশ। ব্যক্তিত্বের সাথে চিন্তার সঠিক ব্যবহারের প্রশংসাযোগ্য সমন্বয়।" এতই যখন বলে ফেললেন, আরও একটু যোগ করুন না! "যে মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন তিনি স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিতা।"

● **প্রতিভাধর** আমার একটা রচনায় অত্যন্ত কম নম্বর দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন: "লেখকরা জন্মায়, তাদের তৈরি করা যায় না।" এদিকে আপনি মাইনে নেন ইটালির ভাষা শিক্ষক হিসাবে।

প্রতিভার ধারণাটা একটা বুর্জোয়া সৃষ্টি। জাতি বিদ্বেষ আর আলস্যের সংমিশ্রণে এর জন্ম।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও ধারণাটা খুব কাজে লাগে। একগাদা রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকে কাউকে বাছাই করার ঝামেলা এড়িয়ে একজন দ্য গল্-কে ধরে তাকে "প্রতিভাধর" খেতাব দিয়ে বলে দেওয়া চলে সে আর ফ্রান্স অভিন্ন।

এইভাবেই আপনি আপনার ইটালিয় ভাষার ক্লাস চালান। পিয়েরিনোর ক্ষমতা আছে, আমার নেই। ফুরিয়ে গেল।

পিয়েরিনো তার লেখা নিয়ে কিছু কি ভাবে? বা, যা লেখে তা ভেবে লেখে? তাতে কিছু যায় আসে না। ওর চারপাশে যে সমস্ত বই-এর ভিড়, ঠিক সেই রকম আরেকটা বই লিখবে ও। পাঁচশ' পাতার বই, যা থেকে চারশ' পঞ্চাশ পাতা বাদ দিলেও বক্তব্যের কোনো হেরফের ঘটবে না।

আর আমি? হাল ছেড়ে দিতে শিখব। ফিরে যাব আমার অজ পাড়াগাঁয়ে।

আর আপনি? আপনার টেবিলের পিছনে আয়েস করে বসে থাকবেন আর খাতায় খাতায় দাগ মারতে থাকবেন দিব্যি।

● **শিল্পচর্চার স্কুল** অন্য সব শিল্পের মতো ভাল লেখাও একটা শিল্প। এই শিল্পেও দক্ষ হতে শেখানো যায়।

তবে বারবিয়ানাতে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক হয়েছে। একদল চেয়েছিল আমরা যে পদ্ধতিতে লিখি তা বর্ণনা করতে। অন্যেরা বলেছিল, "শিল্প একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ব্যবহৃত প্রণালী যতই সহজ সরল হোক না কেন, পাঠকরা হাসবে।"

গরিব মানুষরা হাসবে না। আর বড়লোকেরা হাসুক যত খুশি, আমরাও ওদের নিয়ে হাসাহাসি করব। গরিব মানুষের মতো দক্ষতার সঙ্গে বই বা সংবাদপত্র লেখার ক্ষমতা ওদের নেই বলে ওদের ব্যঙ্গ করব আমরা।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, যে পাঠকরা আমাদের ভালবাসে, তাদের অবগতির জন্য আমরা সবই লিখে ফেলব।

● **সাদামাটা পদ্ধতি** আমাদের লেখার পদ্ধতি কেমন, বলি শুনুন।

প্রথমে, আমরা সকলে পকেটে একটা করে নোটবই রাখি। যখনই কোনো একটা ভাবনা মনে আসে, তখনই সেটা লিখে রাখি। প্রত্যেকটা ভাবনা আলাদা পাতায়, এক পিঠে।

তারপর একদিন সব ক'টা পাতা একত্র করে একটা বড় টেবিলে সাজাই। একটা একটা করে পাতাগুলো পড়া হয়, একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে। তারপরে, যে পাতাগুলো একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোকে একসাথে জড়ো করে আলাদা আলাদা ভাগ করি। এগুলো মিলে এক একটা পরিচ্ছেদ হবে। প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদ আবার ছোট ছোট ভাগ করা হয় অনুচ্ছেদ তৈরি করার জন্য।

এবারে আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদের এক একটা নামকরণ করতে। যদি নাম ঠিক করতে না পারি তাহলে বুঝি, হয় অনুচ্ছেদটা অর্থহীন অথবা বড় বেশি জিনিস ঢুকে গেছে ওটাতে। কোনো কোনো অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়। কোনোটাকে আবার আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা হয়।

অনুচ্ছেদগুলির নামকরণের সময় কীভাবে সেগুলো সাজানো যুক্তিযুক্ত হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক সময় একটা খসড়া তৈরি হয়ে যায়। খসড়াটা হয়ে গেলে, লেখার সব ক'টা ভাগকে সেই অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলা হয়।

প্রথম ভাগটা নিয়ে এইবার আলাদা পাতাগুলো টেবিলে আবার সাজানো হয়। কোন্ পাতাটা কার পরে যাবে সেটা ঠিক করে নিয়ে তারপরে পরিচ্ছেদটির প্রাথমিক লিখিত রূপদানের কাজ শুরু হয়।

এই অংশটা আমরা অনেকগুলি কপি করি যাতে সকলের সামনে একটা করে কপি থাকে। তারপরে কাঁচি, আঠা, রং, পেন্সিল নিয়ে কাজ শুরু হয়। পাতাগুলো আবার উল্টোপাল্টা করা হয়। নতুন নতুন পাতা যোগ করা হয়। আবার কপি করা হয়।

কোন্ শব্দটা বাদ দেওয়া যায়, কোনো বাড়তি বিশেষণ আছে কি না, পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কি না, মিথ্যে কোনো কথা আছে কি না, কঠিন শব্দ কোন্-গুলো, কোন্ বাক্যটা বেশি দীর্ঘ হয়ে গেছে, একই বাক্যে একটার বেশি ধারণা ঢুকে পড়েছে কি না, এসব খুঁজে বার করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় এবার।

একের পর এক বাইরের লোকের পরামর্শ নিতে শুরু করা হয়। যারা খুব বেশি পড়াশোনা করেনি, তাদের মতামত আমরা বেশি চাই। জোরে পড়তে বলি তাদের। খেয়াল করার চেষ্টা করি, আমরা যা বলতে চেয়েছি তা ওরা বুঝতে পারছে কি না।

ওরা যদি লেখাটাকে আরও পরিষ্কার করতে বলে, তাহলে ওদের প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করি। আর যদি খামোখা কতগুলো কথা আসে কেবল সাবধান-তার খাতিরে, তাহলে সে সব বক্তব্য বাতিল করা হয়।

এরকম কঠিন পরিশ্রম করার পরেও, সকলেরই ব্যবহারযোগ্য এইসব নিয়ম মেনে লেখা দাঁড় করানোর পরেও, কোনো কোনো নির্বোধ বুদ্ধিজীবীর কাছে আমাদের শুনতে হয়, "এ চিঠিটার রচনাশৈলী উল্লেখযোগ্য রকমের ব্যক্তিগত।"

● **আলস্য** স্বীকার করে নিচ্ছেন না কেন, ভাল লেখার রীতিনীতি আপনি একদম জানেন না? আলস্য এই কৌশলের সবচেয়ে বড় শত্রু।

আপনার এত কিছু করার সময় নেই বললে শুনব না। সমস্ত ছাত্ররা মিলেমিশে বছরে যদি একটা দীর্ঘ রচনাও তৈরি করতে পারে, তাও যথেষ্ট হবে।

আর আলস্যের কথাই যখন উঠল, তখন একটা কাজের কথা বলি। আপনার ছাত্ররা কাজটা করলে খুব মজা পাবে। এক বছর ধরে সাইট্টার "ইটালিয়" ভাষায় লেখা ইতিহাস বইটা আসল ইটালির ভাষায় অনুবাদ করুন না!

ফৌজদারী বিচার

আপনি বছরে ২১০ দিন কাজ করেন। তার মধ্যে ৬০ দিন নষ্ট হয় নানা রকম পরীক্ষার পিছনে। ফলে বছরে মাত্র ১৫০ দিন স্কুল চলে। এর অর্ধেক সময় আবার চলে যায় মৌখিক পরীক্ষা নিতে। তার মানে, ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিচারে রায় দিতে আপনি বছরে ব্যয় করেন ১৩৫ দিন। সত্যি সত্যি শিক্ষা-

দানের জন্য মাত্র পঁচাত্তর দিন সময় থাকে। ইচ্ছে থাকলেই শিক্ষাদানের সময় তিনগুণ বাড়াতে পারেন আপনি।

● **ক্লাসে পরীক্ষা** পরীক্ষা নেবার সময় ডেস্কের সারির মধ্যে দিয়ে আপনি পায়চারি করতেন। দেখতেন, আমি ভুল লিখছি, খুব অসুবিধা হচ্ছে আমার। কিন্তু কখনো একটা কথা বলেও সাহায্য করেননি আপনি।

বাড়িতেও আমার একই অবস্থা। কয়েক মাইলের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কাছে সাহায্য চাইতে পারি। বইপত্র নেই। টেলিফোন নেই।

এখন আমি এসেছি "স্কুল"-এ। অনেক দূর থেকে এসেছি, কেউ আমাকে লেখাপড়া শেখাবে এই আশায়। এখানে মা আমায় বিরক্ত করেন না। বাড়িতে মা কথা দিতেন পড়ার সময় ডাকাডাকি করবেন না। তার পরেই একশ' বার এ কথা-সে কথা বলে পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাতেন। এখানে আমার ছোট ভাগ্নে তার স্কুল থেকে দেওয়া বাড়ির কাজে সাহায্য চেয়ে চেয়ে আমাকে জ্বালাতন করে না। এখানে আমার একান্ত নিজস্ব একটা ডেস্ক আছে, জোরালো একটা বাতি আছে। চারদিক নিরিবিলি।

আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। মাত্র কয়েক পা দূরে। এই জিনিসগুলো সব আপনার জানা। আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে।

উল্টে আপনি কী করেন? আমাকে পাহারা দিয়ে সময় নষ্ট করেন। ঠিক মনে হয় আমি একটা চোর।

● **আলস্য আর আতঙ্ক** আপনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন, মৌখিক পরীক্ষার সময়টাকে "স্বাভাবিক পঠনপাঠনের সময় বলে ধরা যায় না। বলেছিলেন, "যেদিন আমার প্রথম ঘণ্টায় ক্লাস থাকবে সেদিন পরের ট্রেনে এসো। প্রথম আধঘণ্টা তো আমার মৌখিক পরীক্ষা নিতেই কেটে যাবে!"

এই পরীক্ষাগুলোর সময় গোটা ক্লাসটা হয় আলস্যে নয় আতঙ্কে ডুবে থাকে। যে ছেলেটাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তারও সময়টা নষ্টই হচ্ছে। সে কেবলই চেষ্টা করে গা ঢাকা দিতে, যা কম বোঝে তা এড়িয়ে যেতে। যা কিছু ওর জানা আছে কেবল সে সব জিনিসের উপর জোর দিতেই ও চেষ্টা চালায়।

আমাদের হাতে যা আছে তা কায়দা করে আপনাকে গছিয়ে দিতে পারলেই আপনাকে খুশি রাখা যায়। সারাক্ষণ কিছু না কিছু বলে গেলেই আপনি খুশি থাকেন। আমরা শিখে গেছি, কী করে ফাঁকা সময়টা শূন্যগর্ভ শব্দ

দিয়ে ভরে রাখতে হয় আপনাকে তোয়াজ করতে। আরও একটা উপায় আছে আপনার মন পাওয়ার। সাপেগনো[১৯] যে সব সমালোচনাসূচক উক্তি করেছেন সেগুলো লিখতে হবে। এমন ভাব করতে হবে যেন মূল বইগুলি পড়ে আমি নিজেই এই কথাগুলো বলছি।

● **ব্যক্তিগত মতামত** কতগুলো "ব্যক্তিগত মত" প্রকাশ করতে পারলে আরও ভাল হয়। এই ধরনের ব্যক্তিগত মতামত সম্পর্কে আপনার খুব উচু ধারণা। "আমার মতে, পেত্রার্ক··· ।"[২০] অথচ, দেখুন গিয়ে ছেলেটি হয়তো পেত্রার্ক-এর একটা কি দু'টোর বেশি কবিতা পড়েইনি। অথবা তাও পড়েছে কি না সন্দেহ!

শুনেছি, কতগুলো আমেরিকান স্কুলে যখনই কোনো শিক্ষক কিছু বলেন- ক্লাসের অর্ধেক ছেলে হাত তুলে বলে "আমি একমত।" বাকি অর্ধেক বলে, "আমার আপত্তি আছে।" তারপরে তারা দল পাল্টায়, মহা আনন্দে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে।

নিজের অজানা কোনো বিষয় প্রসঙ্গে কোনো ছেলে যদি "ব্যক্তিগত মত" প্রকাশ করে তাহলে তাকে মূর্খ ছাড়া কী বলা যায়? এজন্য তাকে প্রশংসা করা একেবারেই উচিত নয়। স্কুলে তো সকলে শিক্ষকেরই বক্তব্য শুনতে যায়।

ক্বচিৎ কদাচিৎ এমন ঘটতে পারে যে আমাদের নিজেদের জানা কোনো কিছু গোটা ক্লাসের জন্য বা শিক্ষকের জন্যও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কেবল একটা মতামত অথবা কোনো বই থেকে তুলে দেওয়া নিছক একটা উদ্ধৃতির কথা বলছি না। বাড়িতে বা রাস্তায় অথবা বনে-জঙ্গলে আমাদের নিজেদের চোখে দেখা কোনো নির্দিষ্ট বস্তু।

● **বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন** এরকম কোনো জিনিস সম্পর্কে আমাকে আপনি কখনো প্রশ্ন করেননি। আমি নিজে থেকে কখনো সে সব জিনিসের কথা বলব না। আপনার ক্ষুদে ভদ্রলোক ছাত্ররা, আদুরে আদুরে মুখ করে নানা রকম প্রশ্ন করে এমন সব জিনিস সম্পর্কে — যেগুলো তারা খুব ভাল

১৯ঃ সাপেগনো ঃ একজন সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। প্রচুর বই পড়েছেন উনি। সেই বইগুলোর তুলনা করে উনি সমালোচনা লেখেন। ওর কথাগুলো খাতায় লিখে যদি সেগুলোকে নিজের বলে চালানো যায় তাহলে শিক্ষকরা খুব খুশি হন।

২০ঃ পেত্রার্ক ঃ চতুর্দশ শতকের একজন ইটালিয় কবি।

করেই জানে। আর আপনি তাদের সবসময় উৎসাহ দিয়ে যান, বলেন, "বাঃ, খুব বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ তো!"

● **আরেকটা মৃত ভাষা** একটা প্রাচীন কবিতার একটা অংশ তুলে দিয়ে আমাকে আপনি বলেন আধুনিক ইটালিয়তে সেটা অনুবাদ করতে। যখন পেরে উঠি না, আপনি মিষ্টি হেসে, ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন, "চেষ্টা করো, পারবে। সোজা তো! কাল পড়ালাম না এটা? তুমি দেখছি বাড়িতে পড়োনি!"

ঠিকই বলেছেন। আমি পড়িনি। কেন পড়ব? আমার ছাত্রদের আমি ভুল কিছু শেখাতে পারব না। প্রাচীন ইটালিয় ভাষা আজকে মৃত। আধুনিক ভাষা শিখতে সময় দেব বেশি।[২১] প্রাচীন ইটালিয় ভাষা ও তার বিচিত্র কথাগুলো ব্যবহার করব কোথায়?

ভাষাগত সব প্রাচীর ডিঙিয়ে, ডিক-এর দিকে হাত বাড়াবার তাগিদে অনেক রকম কসরৎ করতে রাজি ছিলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইটালিয় ভাষার কিছু শব্দ উচ্চারণের আকুল চেষ্টা চালাত ডিক। আমিও অশুদ্ধ "কক্‌নি"-তে ওর সাথে আদিরসাত্মক রসিকতা চালাতাম। যতদূর সম্ভব বিকৃত করতাম উচ্চারণ। এই "কক্‌নি" কখনো কোনো অফিসের ভিতরে ব্যবহার করা হয় না। "কক্‌নি" ব্যবহার করলে আপনি সর্বদা গরিব মানুষের কাছে থাকতে পারবেন।

● **ব্ল্যাকমেল** ক্লাসের মধ্যে সময় বয়ে যেতে থাকে, কিন্তু আমি কথাই বলতে পারি না। রাগে, হতাশায় আমার মন ভেঙে যেতে চায়।

বেচারি অন্য ছেলেমেয়েরা। তারা বোঝেই না কী ব্যাপার। আপনি ওঁদের শিশুকাল থেকে আপনার মিণ্টি-র[২২] ভাষা রপ্ত করিয়েছেন। স্কুলে একঘেয়েমি থাকবেই, ওরা মেনে নিয়েছে। এবং স্কুলের কাছ থেকে অন্য কিছু আশাই করে না।

ভালবেসে, সমব্যথী হয়ে ওরা আমাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে। সেণ্ট ভিনসেণ্ট দাতব্য সমাজের তরুণ কর্মীরা যেমন বোঝে না, তেমন ওরাও দেখতে

২১ঃ বাংলা অনুবাদকের বক্তব্য ঃ মূল বইতে এই অনুচ্ছেদটিতে প্রাচীন ইটালিয় কবি ইউগো ফস্‌কোলোর একটি কবিতার অংশবিশেষের ভাষা নিয়ে বিশ্লেষণ আছে। অনুচ্ছেদটির ওই অংশের মূল বক্তব্যটাই কেবল এই অনুবাদে যুক্ত করা হয়েছে।

২২ঃ মিণ্টি ঃ ঊনবিংশ শতকের কবি। ইলিয়াড-এর অনুবাদক।

পায় না যে আমার মধ্যে ঘৃণা উপচে পড়ছে।

এমন নয় যে আমাকে কেউ অপছন্দ করত। আপনিও না। উৎসাহ দিয়ে আপনি বলতেন, "ঘাবড়িও না। আমি কি তোমাকে খেয়ে ফেলব?" আপনি আমার প্রতি আপনার কর্তব্যটুকু পালন করতে চেয়েছিলেন।

'অথচ আপনার হাতের ওই ডিপ্লোমা নামক ব্ল্যাকমেল করার অস্ত্রটির জোরে আপনি আমার প্রত্যেকটি আদর্শকে ধ্বংস করে ফেলছিলেন।

● **শিল্প** মৌখিক ওই পরীক্ষাগুলোর সময় যদি শান্ত হওয়ার সময় পেতাম (যেমন এই মুহূর্তে বন্ধুদের সহযোগিতায় লিখতে গিয়ে সময় পাচ্ছি) তাহলে আপনাকে বোঝাতে পারতাম। ঠিক পারতাম। আপনি অমানুষ তো আর নন!

কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে আসছিল কেবল কতগুলো গালিগালাজ। এমন কতগুলো গালাগাল যেগুলো আমরা মনের মধ্যে চেপে রেখে সেগুলোকে যুক্তিতর্কে পরিণত করার চেষ্টা করি।

দেখুন, শিল্প কাকে বলে তা আমরা বুঝি। কথাটার অর্থ বুঝিয়ে বলি। শিল্প সৃষ্টির খাতিরে কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুকে অপছন্দ করেই থেমে না থেকে সে সম্পর্কে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি। দল বেঁধে, ধৈর্য ধরে সেগুলো নিয়ে কাজ করার সময়ে পেয়েছি বন্ধুদের সাহায্য।

ঘৃণার অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে সত্য উদ্ঘাটিত হবে। একটা শিল্পকর্মের জন্ম হবে: শত্রুর দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হবে একটা হাত, নিজেকে পাল্টানোর চেষ্টায় তাকে সাহায্য করতে।

সংক্রমণ

আপনার স্কুলে একমাস পড়ার পরে আমাকেও রোগে ধরেছিল।

মৌখিক পরীক্ষার সময় বুকে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যেত। দেখতাম, যা আমার না হলে ভাল হয় তা অন্যের হোক — এমন আশা করতে শুরু করে দিয়েছি।

পড়া শুনতে ভুলে যেতাম। এক ঘণ্টা পরে যে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে কেবল তারই কথা ভাবতে শুরু করতাম।

সবচেয়ে ভাল আর চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলো নিষ্প্রাণ আর সীমাবদ্ধ হয়ে

পড়ত। বাইরের বৃহত্তর জগতের সাথে তাদের যেন কোনো সম্পর্কই নেই বলে মনে হ'ত। মনে হ'ত যেন শিক্ষকের টেবিল আর ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যেকার ওই ইঞ্চি কয়েক জায়গার মধ্যেই তাদের স্থান।

● **পোকা** বাড়িতে, লক্ষই করতাম না মা কখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রতিবেশীদের কথা ভাবতামই না। খবরের কাগজ পড়তাম না। রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হ'ত না।

মা কাঁদতেন। বাবা দাঁতে দাঁত চেপে গজগজ করতেন, বলতেন, "জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে তুই ভাল থাকতিস্।"

বই-এর পোকার মতো কেবল পড়তাম।

এর আগে, কিছু পড়ার সময় ভাববার চেষ্টা করতাম বিষয়টা যেন আমার ছাত্রদের পড়াচ্ছি। কোনো কিছুকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে পাঠ্যবই ফেলে অন্য বইপত্রের গভীরে প্রবেশ করে সে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করতাম।

আপনার চিকিৎসাধীন থাকার পরে, পাঠ্যবইটা পর্যন্ত বড্ড বড় মনে হ'ত। দেখতাম, জরুরি কথাগুলোর তলায় কালি দিয়ে দাগ দিতে শুরু করেছি। পরে আমার সহপাঠীরা সন্ধান দিল আরো পাতলা ক্ষুদ্রতর বই-এর। মুখস্থ করার সুবিধা হবে। যে সব বই আমাদের স্বল্পবুদ্ধি মাথাগুলোর জন্য বিশেষ করে প্রস্তুত।

● **সন্দেহ** এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যখন মনে হ'ত আপনিই সঠিক; আপনার সংস্কৃতিটাই একমাত্র মূল্যবান। হয়তো, ওই নিঃসঙ্গ জীবনে বন্দী হয়ে, সরল মনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। এই সারল্য অবশ্য আপনি বহু শতাব্দী পূর্বেই পিছনে ঝেড়ে ফেলে এসেছেন।

আমাদের স্বপ্নের সেই ভাষা, যা সকলেই পড়তে পারবে, যে ভাষায় শুধু সহজ সরল শব্দই ব্যবহার হবে, তার দেখা মেলে হয়তো কেবল কল্পলোকেই। আমাদের কল্পনা হয়তো শুধুই কল্পনা, অবাস্তব দিবাস্বপ্ন।

একচুলের জন্য আপনার মতো হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি। গরিব ঘরের ওইসব ছেলেমেয়ে — যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নিজেদের জাত বদলে ফেলে তাদের মতো হয়ে যাইনি ভাগ্যিস!

● **বাইরের লোক** অবশ্য আপনার পছন্দসই বিকৃত ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার জন্য আমি যথেষ্ট সময় পাইনি। জুন মাসে ইটালিয় ভাষায় আপনি আমাকে দিলেন পাঁচ নম্বর আর ল্যাটিনে দিলেন চার।

বনের মধ্য দিয়ে সেই শুঁড়ি পথ বেয়ে আবার ফিরে এলাম বারবিরানা। পড়তে শুরু করলাম এক শিশুর মতো, দিনের পর দিন, ভোরবেলা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

কিন্তু স্কুলের পুরো রুটিনটা আর আমাকে মানতে হ'ত না। দু'টো পরীক্ষা আবার দিতে হবে বলে আমার শিক্ষাগুরু আমাকে ছোট ছোট ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলেন। খবরের কাগজও আর পড়তে হ'ত না। নিরিবিলিতে পড়তে পারব বলে একটা ঘরে একা একা পড়ার সুযোগ পেলাম। আরও পেলাম কতগুলো বই, যেগুলো আমার বাড়িতে নেই।

নিরবচ্ছিন্ন পড়তাম। পড়াশোনার অন্ধকূপ ছেড়ে বেরোতাম কেবল চিঠিগুলো পড়ার জন্য।

চি ঠি প ত্র

● **ভিক্ষে** আলজেরিয়া থেকে ফ্রানকুচ্চিও ঃ

"...এখানে কোথাও কোথাও মাটির রঙ একদম লাল। একটুও ঘাস নেই। হঠাৎ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে যায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াই কী হয়েছে দেখতে। রঙচঙে ঘাঘরা পরা তিনটে মেয়ে নিচু হয়ে পায়ের কাছ থেকে কী তুলছে। ওরা ট্রেনের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। কিন্তু ভিক্ষে চায় না। তবুও লোকে ওদের কিছু না কিছু ছুঁড়ে দেয়। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো ওরা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। ওরা শেষ কামরাটার কাছে পৌঁছলে, তবেই এঞ্জিন চালক আবার ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিতে ট্রেনটা চালাতে শুরু করে। সকলে বলল, বেন বেল্লা এই ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে চেয়েছিল — কিন্তু বুমেদিন এ অভ্যাস চলতে দিচ্ছে। ঘটনাটা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। কে ঠিক? আপনার কী মনে হয়, মাস্টারমশাই?"

● **গরিবের ভাষা** ফ্রানকুচ্চিও-র আরেকটি চিঠি ঃ

"...রাস্তায় একটা কাঠের চাকা পেয়ে সেটাকে নিয়ে লোফালুফি করছিলাম। প্রায় কুড়িটা বাচ্চা আমাকে ঘিরে ধরল, হাসতে হাসতে হাত তুলে ইশারায় ওদের দিকে ছুঁড়ে দিতে ইঙ্গিত করল। ছুঁড়ে দিলাম। পাঁচ মিনিট এইভাবে চলল, একটাও কথা বিনিময় না করেই। বাচ্চাগুলোর মধ্যে যে বয়সে সব-

চেয়ে বড় সে হঠাৎ ইশারা করল থামতে। আমার হাতের আরবি খবরের কাগজটা ওর চোখে পড়েছে। আরবি ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোত্থেকে এসেছি, এখানে কী করছি। ছোট্ট মসজিদটার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে "মুয়েজ্জিন" আমাদের কাছে এসে খুব দ্রুত কথা বলতে শুরু করলেন। ওঁর প্রশ্নগুলো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, ফলে স্বীকার করতেই হল আমি আরববাসী নই, কিন্তু আরবি ভাষা পড়তে পারি। খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে কোরান পড়াতে উনি মসজিদের ভেতর নিয়ে গেলেন।"

● **ধর্ম** ফ্রান্স থেকে, সান্‌দ্রো :

"...একটা গলিতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটা আমার কাছে ভাড়া চাইল। আমি বললাম, 'আরে ভাই, আমিও একজন ক্যাথলিক।' শুনে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল সে আমাকে ওখানে ফেলে। বড় রাস্তায় পৌঁছতে প্রায় চার কিলোমিটার হাঁটতে হল।"

● **সেদ্ধ সূর্যমুখী** ওয়েলস্[২৩] থেকে, ফ্র্যাঙ্কো :

"...বিদেশীদের পাপ স্বীকার করানোর জন্য পাদ্রি একটা বিশেষ পুস্তিকা রেখেছেন। ওঁকে বললেই হবে, 'পঁচিশ নম্বর পাপ আমি দু'বার করেছি। বারো নম্বর পাপ করার প্রলোভন তিন বার সামলে উঠেছি।'' উনি আমাকে একবার পঁচিশ নম্বর পাপের উপরে দীর্ঘ হিতোপদেশ শুনিয়েছিলেন।

"ছোটখাটো চেহারার এক বৃদ্ধা মহিলার সবজি বাগানে মালীর কাজ করি। আজকে সারাদিন সূর্যমুখী ফুল তুলেছি। বৃদ্ধা নিজে নিরামিষ খান, কিন্তু আমার জন্য মাংস কিনতে যাচ্ছিলেন। আমি বারণ করলাম, বললাম — 'একটা নতুন অভিজ্ঞতা হোক না।' তখন দু'টো সূর্যমুখীর ডাঁটা তুলে উনি সেদ্ধ করে দিলেন আমার জন্য।"

● **রাজনীতিবিমুখ একটি মেয়ে** মার্সাই থেকে, ফার্লো :

"...একজন পাদ্রির সাথে একদল ইটালিয়ান ছাত্র এসেছে। আলজেরিয়া-বাসীদের জন্য ব্যারাক তৈরি করে দিচ্ছে ওরা পারিশ্রমিক ছাড়াই। ওরা ফরাসি ভাষা শেখার একটুও চেষ্টা করছে না। রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা শুনতে তাদের আগ্রহ নেই। ভ্যাটিকান পরিষদ সম্পর্কে সারাক্ষণ বক্‌বক্ করছে ওরা, কিন্তু গাঁইতি নিয়ে কাজ করতে বিশেষ দেখা যায় না তাদের।

---

২৩ : ওয়েলস্ : ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের একটি অঞ্চল।

ওদের মধ্যে একটি বেশ মাথামোটা মেয়ে আছে। আজ রাত্রে এই চিঠিটা লিখতে ঘরে ঢুকেছি, মেয়েটা আমার পিছনে পিছনে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, ফ্লোরেন্স-এর ছেলেদের সম্পর্কে ও না কি একেবারে পাগল!"

● **মিথ্যার প্রশংসা** লণ্ডন থেকে, এডোয়ার্ডো:

"...দোষটা বাবা-মায়ের, যারা ছেলেমেয়েদের বেশি আদর দেন। কেমন করে টাকাপয়সা খরচ করতে হয় তা ওদের শেখান না ওঁরা, হুকুম দিতে দেন আর ওদের সাথে এমন ব্যবহার করেন যে মনে হয় ওরা বড় হয়ে গেছে। বাচ্চারা বাবা-মাকে বিশ্বাস করতে শেখে ঠিকই, কিন্তু একটা ছেলেকে অজস্র খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখার জন্য একটা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কি এতই খারাপ? বোঝাতে পারলাম না বোধহয় — কী বলছি। ঠিকই, ইংরেজ ছেলে-মেয়েরা খুব সৎ। কিন্তু তাতে লাভ কী? ওদের মায়েরা তো ওদের কখনোই বকেন না। বাবা-মায়েদের এর ফলে কী লাভ হয়? যে জিনিসটা খারাপ বলে জানি সে বিষয়েই তো মিথ্যা কথা বলি। আর তাই তো ওই কাজ দ্বিতীয়বার করার আগে দু'বার ভাবি।"

● **আমাদের প্রশংসা** ইংল্যাণ্ড থেকে একজন বৃদ্ধ ইউনিয়ন কর্মী পাওলো সম্বন্ধে লিখছেন:

"...আমাদের কারখানার পক্ষে ও ভগবানের আশীর্বাদ। তোমাদের স্কুলের গৌরব। আমার মনে হয়, ঈশ্বরই এই ব্যবস্থা করেছেন। এত প্রাণবন্ত ছেলে ও! তুমি আর আমি পরস্পরের থেকে এত দূরে থাকি, অথচ ভাবি আর কথা বলি একই রকম। এখানে শ্রমিকদের অনেকে যখন রক্ষণশীল-দের ভোট দেয় আর মালিকপক্ষের খবরের কাগজ পড়ে, তখন ওদের বলি, 'এই ছেলেটা সেই ইটালি থেকে এতদূর কবে আসবে তারই অপেক্ষায় যেন ছিলাম আমি। ওই একমাত্র লোক দেখছি যে আমারই মতো করে ভাবে। একটা ছোকরা, তায় আবার রোমান ক্যাথলিক — সে কি না তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছে'।"[২৪]

২৪: একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী আঠারো বছরের কম বয়সী কোনো ছেলের বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু শ্রম সম্পর্কিত আইন কেবল ইটালিতেই লঙ্ঘিত হয় তা নয়। বারবিয়ানার ছেলেরা কাজ পেয়েছে ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া এবং লিবিয়াতে। উপরে উদ্ধৃত চিঠিগুলির লেখকদের বয়স কত শুনুন। ফ্রানকুচ্চিওর বয়স

● **আন্নিবাল কারো** সব ক'টা চিঠি পড়া হয়ে গেলে আবার "এনিয়াড" নিয়ে দরজা বন্ধ করে পড়তে বসি।

একটা ঘটনা বর্ণনা করি। আপনার পছন্দসই জায়গাটা।

দু'জন গুণ্ডা কিছু ঘুমন্ত লোকের পেটে ছুরি চালিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করছে। একটা তালিকা রয়েছে। কী আছে তাতে? ক'জন লোকের পেট ফাঁসানো হয়েছে, কী কী মাল লুঠ করা হয়েছে, কয়েকজন লোকের নাম যাদের একটা করে কোমরবন্ধ উপহার দেওয়া হয়েছে এবং সেই কোমরবন্ধের ওজন কত। পুরোটা আবার লেখা হয়েছে একটা মরে হেজে যাওয়া ভাষায়।[২৫]

"এনিয়াড" কিন্তু পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আপনি ওটা বাছাই করেছেন। আপনাকে আমি কখনো এ জন্য ক্ষমা করব না।

আমার বন্ধুরা অবশ্য আমাকে মার্জনা করেছে। ওরা জানে আমার জীবনের লক্ষ শিক্ষক হওয়া। তাই এ সব পড়তে হচ্ছে। কিন্তু আপনারই মতো আমিও সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি।

রোগ নিরাময়

● **ভাসা ভাসা** সেপ্টেম্বর মাসে দুটো পরীক্ষাতেই আবার আমাকে চার দিলেন। আপনি আপনার মুদিখানার ব্যবসাটাও ভাল চালাতে পারেন না। আপনার দাঁড়িপাল্লাটা কাজ করছে না ভাল। জুন মাসে আমি যা জানতাম, সেপ্টেম্বরে এসে তার পরিমাণটা কমে যাবে কী করে?

আপনি একটা সুইচ টিপলেন। একটা ছেলে নিভে গেল। কিন্তু আসলে, নিজের অজ্ঞাতসারেই, আপনি আমার মনে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। আমার চোখ খুলে গেল। পরিষ্কার চিনলাম আপনাকে আর আপনার সংস্কৃতিকে।

এই প্রথম একটা গালাগাল খুঁজে পেয়েছি যা আপনার চরিত্রকে স্পষ্ট

ষোলো, সান্দ্রোর পনেরো, ফ্রাঙ্কোর চোদ্দ, কার্লো ও এডোয়ার্ডোর ষোলো।

২৫: ইটালির স্কুলে আন্নিবাল কারো নামক একজন ষোড়শ শতাব্দীর কবির অনূদিত "এনিয়াড" পড়ানো হয়।

ফুটিয়ে তোলে — সোজা কথায়, আপনার সবই খুব ভাসা ভাসা। আপনারা নিজেরা মিলে একটা পারস্পরিক পিঠ চুলকানো সমিতি খুলেছেন। চালিয়ে যেতে পারছেন বেশ, কারণ আপনারা সংখ্যায় খুব কম।

● **প্রতিশোধ** আমার বাবা আর ভাই জঙ্গলে কাঠ কাটতে যান আমার জন্য। আরেকবার ওই পরীক্ষাটা দেবার জন্য পড়াশোনা করতে যেতে পারব না। কিন্তু পৃথিবী তার মতো চলবে আর আমি পিঠে কাঠের বোঝা বইব, তাও হবে না। আপনাকে অত খুশি করতে পারব না।

কাজেই আবার বারবিয়ানা ফিরলাম। জুন মাসে পরীক্ষাটা দিতে গেলাম আবার।

আবার ফেল করালেন আপনি। ঠিক যেন মাটিতে থুতু ফেলছেন। আমি কিন্তু হাল ছাড়ব না। আমি শিক্ষক হবই। আপনার চাইতে অনেক ভাল শিক্ষক হব। সেই হবে আমার প্রতিশোধ।

● **দ্বিতীয় প্রতিশোধ** এই চিঠিটা আমার আরেক ধরনের প্রতিশোধ নেওয়া। আমরা সবাই মিলে লিখেছি তো এটা!

এমনকি জিয়ানীও খানিকটা কাজ করেছিল। ওর বাবা এখন হাসপাতালে। জিয়ানী এখন যেমন সাহসী পুরুষ, তেমন যদি গত বছরও থাকত! কিন্তু এখন স্কুলে পড়ার পক্ষে বড্ড দেরি হয়ে গেছে ওর। শিক্ষা-নবিশের কাজ করে ও যে টাকাটা রোজগার করে সে টাকা ওর পরিবারের খুব দরকার। এই চিঠিটার কথা শুনেই ও বলে দিল — রবিবার রবিবার এসে ও আমাদের সাহায্য করবে।

এল ঠিকই। পড়ল চিঠিটা। কয়েকটা শব্দ আর কথা দেখিয়ে বলল, এগুলো বেশি কঠিন। আপনার কয়েকটা বাছা বাছা দুষমনির কথা মনে করিয়ে দিল। ওকে নিয়ে যে কোনো রসিকতা করার অনুমতিও দিল। বলতে গেলে ওই তো এই বই-এর প্রধান লেখক।

কিন্তু এ জন্য যেন আবার আত্মতৃপ্তি বোধ করবেন না। আপনার বিবেকের উপরে ও কিন্তু একটা নিদারুণ বোঝা। এখনও ও নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

● **উত্তরের অপেক্ষায় আছি** এখানে আমরা এখন উত্তরের অপেক্ষায় আছি। কোথাও কোনো "ম্যাজিস্ট্রেল"-এ এমন কেউ নিশ্চয় আছেন, যিনি আমাদের লিখবেন,

স্নেহাস্পদেষু,

সব মাস্টারমশাই কিন্তু তোমাদের ওই মহিলার মতো নন। তোমরাও যেন জাতি বিদ্বেষের শিকার হয়ো না।

তোমরা যা লিখেছো তার সাথে সবটা একমত নই। কিন্তু এ কথা জানি যে, আমাদের স্কুল যথেষ্ট ভাল নয়। একমাত্র একটা নিখুঁত স্কুলই পারে নতুন নতুন মানুষ, নতুন নতুন সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে। কিন্তু নিখুঁত স্কুল বলে কিছু হয় না। তোমাদের স্কুলও নিখুঁত নয়, আমাদেরটাও নয়।

তবে, তোমাদের মধ্যে শিক্ষক হতে চাও যারা তারা যদি এখানে এসে পরীক্ষা দিতে চাও, তাদের বলি, এখানে আমার কিছু সহকর্মী তাদের মুখ চেয়ে চোখ বুজে থাকবেন।

শিক্ষাতত্ত্বের পরীক্ষায় কেবল জিয়ানীর কথা জিগ্যেস করব। সাহিত্যের পরীক্ষায় জানতে চাইব — এই অপূর্ব চিঠিটা লিখলে কী করে? তোমার দাদু এখনও যে কয়েকটা ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করেন সেগুলোর অর্থ জানতে চাইব ল্যাটিন পরীক্ষা নিতে গিয়ে। ভূগোলের প্রশ্নে থাকবে ইংল্যাণ্ডের কৃষকদের বিষয়। ইতিহাসের পরীক্ষায় বলতে বলব পাহাড়ি লোকেরা সমতলভূমিতে এল কী কী কারণে। বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন আমাদের বলো, শাক-সবুজির কথা আর যে গাছটায় চেরি ফলে সে গাছটার সঠিক নাম কী?

এই চিঠিটার অপেক্ষায় আছি। আমরা জানি, এ চিঠি আসবেই।

আমাদের ঠিকানা: স্কুওলো ডি বারবিয়ানা,
ভিচ্চিও মুয়েলো,
ফিরেনজে, ইটালি।[২৬]

২৬: ইংরেজি অনুবাদকের টিকা: নতুন ঠিকানা হল — রাগাটজি, ডি বারবিয়ানা, ভিয়া ডেল কাইয়ে ৫১, ক্যালেন্‌জানো — ফিরেনজে, ইটালি।

বারবিয়ানা স্কুলের অনুমতি পত্র

প্রিয় সলিল,

আমাদের বই "লেটার টু এ টিচার"-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবার অনুমতি চেয়ে লেখা আপনার চিঠি পেয়েছি।

আমরা সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি বাংলা অনুবাদের। কোনোরকম টাকা পয়সা নেবার প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবীতে যত ছেলে বাধ্য হয়ে লেখাপড়া ছেড়েছে, তাদের ভালবাসি বলেই আমরা বইটা লিখেছি, টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে নয়। কাজেই, স্বচ্ছন্দে অনুবাদ করুন। শুধু একটা কথা — অনূদিত বইটার অন্তত একটা কপি আমাদের পাঠিয়ে দেবেন। আমার খুব ভাল লাগবে, কারণ আমি একটু বাংলা জানি। দু'বছর আমি বাংলাদেশে কাটিয়েছি।

ইতি

ফ্রাঙ্কো জেসুয়ালডি

আমার ঠিকানা ঃ
ফ্রাঙ্কো জেসুয়ালডি
ভিয়া ডেইয়া বারা ৩২,
৫৬০১৯ ভেচ্চিয়ানো,
পিসা, ইটালি।

প্রাক্তকথা

নৈঃশব্দের সংস্কৃতি ভাঙার আওয়াজ

খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমই যে খালি মালিকরা নিংড়ে নেয় তা নয়। নিংড়ে নেয় তাদের নিজস্ব চিন্তা, নিজস্ব ভাষা। মনের বৃত্তিতে বৃত্তিতে সাংস্কৃতিক আক্রমণ চালিয়ে নষ্ট করে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে। ভাষা ও স্বকীয়তা হারানো এই অস্তিত্বের নাম পাওলো ফ্রেয়ার দিয়েছেন "নৈঃশব্দের সংস্কৃতি।" বারবিয়ানা স্কুলের ছেলেরা এই নৈঃশব্দের সংস্কৃতির শিকার। অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা তাদের কলমে শব্দ এনে দিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার ফসল এই আশ্চর্য বইটি।

হয়তো অনেকে এদের মতামত সব মানতে পারবেন না। কিন্তু এই বইটি পড়ার পর কোনো শিক্ষক অবিচলিত থাকবেন, এমন ভাবা কঠিন। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের অনেকের জীবনেও বইটি ছাপ ফেলেছে। শিক্ষা নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা, ভাষণ ও সেমিনারের জগতের নীরস গতানুগতিকতার ঘানি টেনে তখন আমরা ক্লান্ত। শিক্ষার নতুন এক বাতাস কেমন করে ল্যাটিন আমেরিকার গ্রামে, নিউ ইয়র্কে কালোদের বসতিতে অচলায়তনের জানালা খুলে বয়ে চলেছে তা জেনে উৎসাহিত। কিন্তু নিজেরা শুরু করার পথ ঠাহর করতে পারছি না খুব স্পষ্ট করে। বারবিয়ানার ছেলেরা এমন সময় দমকা তাজা হাওয়ার মতো তাদের চিন্তাভাবনার ঝাপটায় উড়িয়ে দিল আমাদের মন থেকে অনিশ্চয়তার কুয়াশা।

চালু শিক্ষাব্যবস্থার মোদ্দা ফলাফলকে এরা ধরে দিয়েছে। যারা খেটে খায় তাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পর্যায়ের পর পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যাদের সঙ্গতি আছে কেবল তারাই নিজেদের ইচ্ছামতো পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। বলা বাহুল্য — এরাই ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, বিধায়ক অর্থাৎ সমাজপতি, প্রশাসক বনে দেশ চালায়।

আমাদের দেশে নয় দশ বছর বয়স হলেই খেটে খাওয়া মানুষের ঘরের ছেলেমেয়েদের কাজে লাগতে হয় — ঘরে ও বাইরে। পড়াশোনা ছেড়ে

দেওয়ার এটা অন্যতম কারণ। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। বরং আলোচনায় এটার উপর এত জোর পড়তে থাকে যে, আড়ালে চলে যায় আর একটা বড় কারণ। সেটা হল চালু শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈষম্যের ঝোঁক।

আমাদের দেশের সাবেকি বামপন্থী চিন্তায় শিক্ষা প্রসারের উপরই কেবল জোর বাড়ছে। খেটে খাওয়া মানুষের ঘরের ছেলেমেয়ে কেমন করে প্রসারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে, অভাবের ফলে স্কুল ছেড়ে দেওয়া কেমন করে বন্ধ করা যায়, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা, আলোচনা লক্ষ করা যায়। কিন্তু চালু শিক্ষাকে ছেলেমেয়ের মুখের কাছে ধরতে পারলেই কি তারা তা গিলবে, না তাদের পুষ্টি হবে? চালু শিক্ষাব্যবস্থা কি আদৌ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে উপযোগী? শিক্ষার প্রণালী আর বিষয়বস্তু কি শ্রেণী নিরপেক্ষ? এই সব প্রশ্ন নিয়ে বেশি চর্চা হয়নি।

ইটালিতে বৈষম্যের অভাব নেই, কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের মান আমাদের দেশের চেয়ে উচু। তাই, কেন ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে অভাব ছাড়াও চালু শিক্ষা প্রণালীর অবদান বারবিয়ানা স্কুলের ছেলেদের চোখে ধরা পড়ে গেছে। সরকারি নিয়মে বাঁধা শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক তারা তোলেনি, কিন্তু যেভাবে স্কুলে, ক্লাসঘরে শিক্ষার কাজকর্ম বাস্তবে চলে তার ফলে "শিক্ষিত" কিছু "ভদ্রলোক"ই যে তৈরি হয় আর বিপুল সংখ্যায় ছেলেমেয়েকে "অশিক্ষিত", "ছোটলোক" হিসাবে বর্জন করা হয় — এই ঘটনাকে নির্মম হাতে তারা পরিবেশন করেছে একের পর এক ছেলের জীবনের কাহিনী আর পরিসংখ্যানের মাধ্যমে।

"এলিট"-শাসিত সমাজে "এলিট" তৈরি, এক পুরুষ থেকে পরের পুরুষে "এলিট"-এর পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াতে শিক্ষার ভূমিকাটি তাদের কলমে বাস্তবতার ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যে "ভাল" ছেলে, চালু শিক্ষাব্যবস্থায় সে আরো "ভাল" হওয়ার সুযোগ পায়। যে পিছিয়ে পড়ে, চালু শিক্ষা-ব্যবস্থা তাকে বর্জনের পথে ক্রমান্বয়েই ঠেলে নিয়ে যায়। ফলে যে ছেলেমেয়ে-দের পরিবেশে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আছে, তারাই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেশি বেশি করে উপকৃত হয়। "এলিট" সংরক্ষিত হয়।

শুধু তাই নয়। "এলিট"-এর বাইরে থেকে যে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ের সহজাত ক্ষমতা তাদের পরিবেশের প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে উঠছে, "গণতান্ত্রিক" শিক্ষাব্যবস্থা তাদের বেছে নিয়ে "এলিট"-এ অন্তর্ভুক্ত করার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে, তাতেও সরাসরি "এলিট" সমৃদ্ধ হচ্ছে। আবার খেটে খাওয়া মানুষের

স্বাভাবিক নেতাদের অঙ্কুরেই উৎপাটন করে "এলিট" নিজেকে সুরক্ষিত করছে। প্রায়ই এদেরকে "এলিট"-এর ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত ও অনুগত করে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে অনার্য "সাব-অলটারন্"-দের বিভীষণ নেতা হিসাবে।

বারবিয়ানার ছেলেরা শিক্ষকদের করেছে সমালোচনার কেন্দ্রবস্তু। বারবিয়ানার স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পাদ্রি মিলানির শিক্ষায় তাদের আস্থা হয়েছে মুক্ত। তাই শিক্ষাদান তাদের আদর্শ শিক্ষকের পেশা নয়, এ তাঁর ব্রত। তাদের মতে শিক্ষক ব্রহ্মচারী হলেই ভাল, গৃহী হলে স্বামী-স্ত্রী গৃহকেই বানাবেন শিক্ষালয়, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চলবে সংসার। এই চাহিদা অবাস্তব শোনালেও বুঝতে হবে যে, আসলে তারা সেই শিক্ষককে আবাহন করছে যিনি পাখি পড়া বুলি মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষার প্রতিবন্ধে সস্তা যাচাই-কলের হাতল ঘোরানোর পন্তনিদার হবেন না। ছাত্রের অন্তরে তিনি জেবলে দেবেন বাতি। নিজেরই আলোতে জগৎকে সে জানবে, বুঝবে, জগতের সামনে প্রকাশ করতে শিখবে নিজের কথা।

বাস্তবে তারা বারবিয়ানা স্কুলের বাইরে পেয়েছে ব্রতধারী নয়, পেশাদারী শিক্ষককে। এ শিক্ষক "ভাল" ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ান, পড়া যারা পারে না তাদের বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। পিছিয়ে পড়া যে ছেলেকে ফেল-এর মার্কা দেন, কোনোদিন ভাবেনও না তার সমস্যা কোথায় বা কেন। বাবা-মা তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, বেমালুমই শিক্ষক ভুলে যান তার অস্তিত্ব। বেতন বাড়াবার জন্য ইনি শ্রমিকদের কায়দামতো গলা উঁচু করেন। কিন্তু গড়ে বছরে সময় দেন শ্রমিকদের চেয়ে অনেক কম। স্কুলের পরে ছাত্রদের নিয়ে কোনো চিন্তাই জাগে না তাঁর মনে। "স্কুলের পরে সাহায্য"-এর সরকারি প্রকল্পে তিনি অনুপস্থিত, উপরি আয়ের জন্য তিনি তখন একান্তে পড়াচ্ছেন বিত্তবানের সন্তানকে।

অথচ বারবিয়ানা স্কুলের ছেলেরা বলে, যারা পারছে না তাদেরই তো সাহায্য বেশি করে দরকার, তেলা মাথায় তেল ঢেলে কী হবে? ক'জন ছাত্র খুব ভাল ফলাফল করেছে, তার বদলে উৎকর্ষের মাপকাঠি হওয়া উচিত কত বেশি ছাত্রকে শিক্ষার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে এগিয়ে দেওয়া যাচ্ছে, কত কম ছাত্র বর্জিত হচ্ছে।

দুনিয়া জুড়েই শিক্ষকদের ভাবনা হওয়া উচিত এ নিয়ে। তাই "প্রিয় স্যার" সম্বোধন দিয়ে বইটি শুরু।

খেটে খাওয়া ঘরের ছেলেমেয়ে পড়তে চায় না, এই গালগল্পের মূলোৎ-

পাটন করে দিয়েছে এই বইটি। পড়াশোনার বদলে গরুর গোয়াল পরিষ্কার করতে কিশোর ভালবাসে? ভালবাসে ফুটপাথ থেকে ময়লা কুড়োতে বা শীতের কাকভোরে কাঁপতে কাঁপতে চায়ের দোকানের উনানে আঁচ দিতে? বারবিয়ানার ছেলেরা যখন সরলভাবে এই প্রশ্ন করে, তখনই বোঝা যায় বহু প্রচলিত এই গল্প কতটা আজগুবি। যেটা ছেলেমেয়েরা ভালবাসে না, তা হল তাদের চেয়ে অনেক ছোটদের ক্লাসে তাদের আটকে রেখে নিত্য গঞ্জনা আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত। বারবিয়ানার ছেলেরা নিজেদের নিদারুণ অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে মত দিয়েছে ক্লাসে আটকে রাখার বিপক্ষে। আর পড়াশোনার আরো সুযোগ, আরো আরো বেশি সময় ধরে পড়াশোনার পক্ষে তারা। তাদের বক্তব্য, যদি শিক্ষক নিয়মরক্ষার বদলে সত্যিই পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের ধরে ধরে শেখাতে থাকেন, তবে দেখা যাবে যে, সময় ও পরিশ্রম দিতে এরা আগ্রহী ও উৎসাহী। ছুটি-ই চাইবে না কেউ!

"স্কুলের পরে সাহায্য", ছুটিতে পড়াশোনা! ছেলেমেয়েরা আদতে পড়তে চায় — তাদের পড়ানো হয় না, পড়ার নামে একটা শাস্তি দেওয়া হয় স্কুলে। এ সব কথা আমাদের চিন্তায় আলোড়ন আনে। খেটে খাওয়া ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধের সঙ্গে সরাসরি পাঞ্জা কষার একটা জায়গা ধরে দেয় বারবিয়ানার ছেলেরা আমাদের সামনে। কলকাতার যে সব বসতিতে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করি আমরা, সেখানে যারা বাস করে তারা নাগরিক সমাজে নিতান্তই প্রান্তিক। দিনমজুর, ছুতোর, ক্ষুদ্র কারখানার শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, ফুটপাথের চাল, ফল, মাছ বিক্রেতা। লক্ষ করি, ছেলেদের এবং কিছুটা কম পরিমাণে মেয়েদেরও স্কুলে পাঠানোর আগ্রহ খুব। স্কুলে বিনা পয়সায় বই দেওয়া হচ্ছে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উত্তরণ অবাধ না হলেও সহজতর হয়েছে — সরকারি নীতিগুলি একটা নতুন সামাজিক চাপ নির্গমের পথ কিছুটা প্রসারিত করেছে।

কিন্তু পাশাপাশি লক্ষ করা গেল যে, এই সব বসতির ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়ে খুব লাভবান হতে পারছে না। স্কুলে যে প্রণালীতে পড়ানো হয় তা অনেকটা দায়ী এর জন্য। শিক্ষক মনে রাখেন না যে, এদের বাড়িতে দেখিয়ে দেওয়ার কেউ নেই, বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা নেই। অনেক স্কুলেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে "স্বরে-অ", "স্বরে-আ" থেকে "কা-কি-কী-কু-কু-কে-কৈ-কো-কৌ" অবধি সমবেত কলতান আর পর পর অক্ষর লিখে যাওয়ার মধ্য দিয়েই ভাষা শিক্ষার গোড়াপত্তন। অঙ্কের বেলাতে, অর্থ না জেনেও ১ থেকে ১০০

লিখতে পারলেই সংখ্যার অর্থ ছাত্র বুঝেছে ধরে নেওয়া হয়।

আমরা দেখলাম যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতেও পড়ছে এমন ছেলেমেয়ে "অ" থেকে "ঃ" টানা লিখে যাচ্ছে, কিন্তু মাঝখান থেকে ধরলে অনেক অক্ষরই লিখতে পারছে না। অক্ষরের ছাঁদ ও ক্রম পরিচিত, কিন্তু ধ্বনি নয়। "ই-উ", "ঈ-ঊ", "ন-স", খুব গুলিয়ে যাচ্ছে। "ই-উ", "ঈ-ঊ" শেখাতে গিয়ে বারবারই শুনতে হয়েছে — "ও মাস্টারমশাই, 'অ-আ' লিখতে দাও"। "অ-আ" লিখে যাওয়া আর ঐ অক্ষরগুলিকেই ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে চেনা তাদের কাছে একেবারেই আলাদা। ১—১০০ লেখার নাম "একে চন্দ্র" লেখা। "একে-চন্দ্র" লিখছে, এমনকি যোগও করছে, কিন্তু যে সংখ্যাগুলি লিখছে তার অর্থ অপরিষ্কার। স্থানীয় মানের ধারণা গড়ে তোলা হয়নি। "৩২" ও "২৩" গুলিয়ে যাচ্ছে।

ক্লাসে পাঠ্য বইয়ের পাঠগুলি জোরে জোরে সমস্বরে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে, বই খুললে গড় গড় করে পড়ে যাবে, কিন্তু বইয়ের পাতার চেনা বিন্যাসের বাইরে সেই শব্দগুলিই পড়তে পারবে না। "বর্ণপরিচয়" ধরে যার স্কুলে মক্‌সো করানো হয়েছে, সে "অচল" লিখতে পারছে, কিন্তু "চল" পারছে না। "কা"-ও লিখছে "ক+া", "কে"-ও লিখেছে "ক+া", যদিও পর পর লিখে যাবে "কা-কি-কী..." ইত্যাদি। যাদের অক্ষর পরিচয় ও স্বর-সংযোজন মোটামুটি রপ্ত হয়েছে, তারাও টানা রিডিং পড়তে পারছে না। অক্ষর জুড়ে মাত্রা, মাত্রা সংযোজনে শব্দের ধারণাগুলি অস্পষ্ট। লিখতে বলা হল, "আমার কাছে গরম ভাত আছে।" লেখা পড়ল, "আরকাগরভাআছে।" কিছু অক্ষর লেখা হল, কিছু মনে থেকে গেল, শব্দগুলি আলাদা থাকল না।

ভাষার গোড়াপত্তনে এই সমস্যার ফলে সব বিষয়ই চলে যায় আয়ত্তের বাইরে। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখেছে কিন্তু প্রশ্নের অঙ্ক বই থেকে বানান করে পড়তে লাগছে দশ মিনিট। অঙ্ক পড়া শেষ হতে হতে শুরুটা মনে আবছা হয়ে গেছে, অঙ্কটা বোঝাই যাচ্ছে না। অথচ সেই অঙ্কই মুখে বলে দিলে চট করে উত্তর দিতে পারছে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে বলে দিনরাত হয়, বুঝিয়ে দিলে সহজেই বুঝছে। কিন্তু পাঠ্যবই থেকে তারপর এই পাঠটিই পড়ে বুঝতে পারছে না। উত্তর লিখতে গলদঘর্ম হচ্ছে। এরা আর পঞ্চম শ্রেণীতে "বড়" স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। অগ্রগতির অভাব দেখে বাড়ির লোকও হতাশ হবে — "আমার ছেলেটার লেখাপড়া হবে না, একটা কাজ জুটিয়ে দেব।"

কেউ বলতে পারেন, "আমরাও কিছু আহামরি ইস্কুলে কোনো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে পড়িনি! আমরা শিখলাম কেমন করে?" আমাদের ঘর অবধি ধাওয়া করার দরকার নেই। ঐ পরিবেশেই আমরা এমন ছেলেমেয়ে পাই যারা স্কুলের পড়া শিখে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, বাড়িতে মা, বৌদি, বাবা — কেউ না কেউ লেখাপড়া জানেন এবং নিয়মিত পড়া দেখিয়ে দেন। শিশুর শিক্ষায় উৎসাহ দানের অপরিহার্যতা এখন মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত সূত্র। বাড়িতে পড়তে বসিয়ে মা দেখিয়ে দিচ্ছেন, আট-কালে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, অনেক চেষ্টার পর ঠিক করলে "বাঃ" বলে আদর করছেন, অমনোযোগী হলে সস্নেহ তিরস্কার করছেন — এই পরিবেশে যেভাবে শিক্ষা এগোয় তার একেবারে বিপরীত পরিবেশ যে স্কুলে, সেখানে পারিবারিক প্রতিবন্ধের ভার টেনে শিশু আছাড় খাবে — এটা বলা বাহুল্য নয় কি? কিশোর-কিশোরীকেও কি স্নেহ-মমতা-উৎসাহ-যত্ন ছাড়া শিক্ষাদান সম্ভব? বারবিয়ানার ছেলেরা তাই দোষী করেছে স্কুলের পরিবেশকে আর এই পরিবেশ যেহেতু অনেকটাই শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে গোড়ার দিকে, তাই তারা শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার অনেকটা দায়ই ফেলেছে শিক্ষকের দোরগোড়ায়।

চাই নতুন ধরনের শিক্ষক, চাই শিক্ষকের মনোভাবে যুগান্ত। প্রসঙ্গত বলতে হয় "দিদিমণি"-দের কথা। স্কুলে শিক্ষার এই দুরবস্থার ফলে ঘরে ঘরে ১০্, ২০্, ৫০্ টাকা দিয়ে ডেকে আনা হচ্ছে "দিদিমণি"-দের। ছাত্র একটু বড় হলে "ঘরের মাষ্টারমশায়"-দের। এক্ষেত্রে ফল অসমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে "দিদিমণি" যেহেতু অল্পবয়স্কা, চালু স্কুলব্যবস্থায় ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে দরকচা মেরে যাননি, তাই যথোপযোগী যত্ন নিয়ে উন্নতি ঘটাচ্ছেন। আবার যে "দিদিমণি" বা "মাষ্টারমশায়" বহু ২৫্ টাকার যজমানের ঘরে লক্ষ্মী পুজো করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ছাত্রছাত্রীরা বাধ্যতামূলক মুখস্থ ক্রিয়া যতদূর টানতে পারে ততদূরই স্কুলের পরীক্ষায় উৎরাতে পারছে, পঞ্চম শ্রেণীতে ঢুকতে পারছে না, বা ঢুকলেও ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণীর পড়ার আগা-মাথা বুঝতে পারছে না। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও গৃহশিক্ষকের আন্তরিকতা ও আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার সাফল্য।

চালু স্কুলব্যবস্থায় তাহলে যার যেমন দরকার সে তেমন সাহায্য পাচ্ছে না। কে কোথায় আটকাচ্ছে দেখা হচ্ছে না, সে যেখানে আটকাচ্ছে সেখানে তাকে সাহায্য করার রীতিও নেই। প্রণালীও নেই। প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম হলেও, পরিমাণে প্রচুর সরকারি টাকাপয়সা খরচের পরেও এই স্কুলগুলি থেকে

লাভ হচ্ছে তাদেরই, যাদের বাড়িতে আলাদা করে যত্ন নেওয়ার সুযোগ ও সামর্থ্য আছে। কলকাতাতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, শিক্ষার পরিমাণে প্রসার ঘটলেই সাংস্কৃতিক অবদমনের সম্পর্কগুলোর পুনরুৎপাদন আপনা থেকে বাধা পায় না। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রণালীর প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা প্রণালী শেষ অবধি স্কুল ঘরে প্রতিটি শিক্ষকের নিজস্ব প্রয়োগের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাই বারবিয়ানার ছেলেরা দুনিয়ার শিক্ষকদের বলছে, "সত্যিই যাতে ছাত্রছাত্রীর শিক্ষালাভ ঘটে তা দেখার জন্য আপনারা যদি সময়, আগ্রহ ও দরদ নিয়ে তৎপর হন, তাহলেই কেবল অবস্থা পাল্টাবে।"

নিঃসন্দেহে স্কুলব্যবস্থার সাধারণ প্রকৃতির খোলনলচে আলাদা করে পাল্টানো সম্ভব নয়। অন্য সমস্ত বৈষম্যের সম্পর্কের মতো এই প্রকৃতিও বৈষম্য পুনরুৎপাদনের সাধারণ সামাজিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু যদি মনে করি যে, এই সম্পর্কগুলোর অবসান খেটে খাওয়া মানুষই ঘটাবে, তাহলে সেই মানুষের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়াও এই সমাজের মধ্যেই শুরু করতে হবে, কারণ নৈঃশব্দের সংস্কৃতির চার দেওয়ালের মধ্যে মুক্তির সাধনা অসম্ভব।

শিক্ষা যেহেতু সাংস্কৃতিক অবদমনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, তাই এখানে নিপীড়কের নজরও কড়া। প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন কতটা সম্ভব তা একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে সেই পরিবর্তনের চেষ্টাও নিশ্চয়ই করা দরকার, আর এই চেষ্টা করতে পারেন একমাত্র শিক্ষকরাই। শেষ বিচারে ক্লাসঘরে শিক্ষকের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক অবদমন মূর্ত হচ্ছে, ফলে নিপীড়নের ফাঁদে নিজের অসহায়তা থেকে মুক্তির জন্যও শিক্ষকের এই পরিবর্তনে সচেষ্ট হওয়া দরকার, কেবল সামাজিক কর্তব্য হিসাবেই নয়।

এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি, চালু শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে, খেটে খাওয়া মানুষের পরিচালনায় তার ঘরের ছেলেমেয়ের শিক্ষার উপযোগী শিক্ষা-কেন্দ্র গড়ে তুলতে বারবিয়ানার ছেলেরা আমাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগায়। একবার শুরু করতেই আমরা তাদের পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনার যাথার্থ্য অনুভব করতে থাকি। দেখি যে, খেটে খাওয়া মানুষ চালু শিক্ষার দৈন্য সম্পর্কে সচেতন, প্রচলিত স্কুল ও হৃদয়হীন শিক্ষকের ওপর বীতশ্রদ্ধ, ক্ষুব্ধ। ছেলেমেয়েরা পড়তে উৎসুক, পরিশ্রমেও পিছপা নয়। আমরা বলেছি যে, "এই কেন্দ্র কোচিং ক্লাস নয়, এখানে কেবল স্কুলের পরীক্ষার জন্য তৈরি করার কাজ হবে না, পাঁচ জনের পাঁচ কথা যাতে বুঝতে পারে আর পাঁচ জনের মধ্যে নিজের কথা যাতে বলতে পারে, তার পথ আমরা খুঁজছি। পথ আমাদের

কাছেও খুব স্পষ্ট নয়।" তবু ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে কেন্দ্রগুলিতে। বন্ধুরা বিশ্বাস করেননি। এসে কথা বলে তবে উপলব্ধি করেছেন — নৈঃশব্দের সংস্কৃতি থেকে বার হওয়ার কি আগ্রহই না মানুষের মধ্যে রয়েছে! শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা প্রণালী কেমন হবে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও বারবিয়ানার ছেলেরা আমাদের পথপ্রদর্শক হয়েছে, কারণ, কেমন হবে না তা তারা পরিষ্কার করে বলে দিতে পেরেছে।

আরো কথা থাকে। যে শিক্ষাব্যবস্থা তার জন্য নয়, সেখান থেকে উপকার পাওয়ার চেষ্টায় খেটে খাওয়া মানুষের ছেলেমেয়ের জন্য বাধা সর্বত্র। যে সব অভিজ্ঞতা বা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়ের সূত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়, সেগুলি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অনেক সময়েই খাপ খায় না, ফলে উদাহরণ সূত্রকে সহজ করার বদলে দুর্বোধ্য করে দেয়। বারবিয়ানার ছেলেরা সামতলিক ক্ষেত্রের একটি অংক তুলে দিয়ে দেখিয়েছে কিভাবে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা সমতলের ধারণাকে স্পষ্ট করার বদলে ছাত্রকে ফেলে ধাঁধায়।

ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখেছি প্রাথমিক পুস্তক কেমনভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথম যখন বর্ণ-সংযোজনে শব্দগঠনের ধারণা তৈরি হচ্ছে তখন জানা শব্দ নিয়ে শুরু করা দরকার। "চ-ল" সহজেই গ্রহণ করে শিশু। কিন্তু "অ-জ" "অজ" অচেনা বলে কঠিন। এই কারণে বর্ণ-পরিচয়ে "বর্ণপরিচয়" অবর্ণনীয় কষ্টের উৎস। "সহজ পাঠ" তার চেয়ে ভাল। সরকারের নতুন "কিশলয়" আরো ভাল। "বর্ণপরিচয়" থেকে "সহজ পাঠ" ও "কিশলয়" বই-গুলিতে শিশুর শব্দজগৎ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষ করা যায়।

তবু "কিশলয়" সমস্যা আনে। দ্বিতীয় বাক্যটিতেই "উট"। "উ-ট" "উট" কলকাতার বসতির শিশুর কাছে কঠিন লাগে, কেন না শব্দটি অপরিচিত। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ঘরের শিশুর কাছে "উট" শুধু নয়, অভিজ্ঞতার বাইরের শব্দও এত সমস্যাজনক নয়, কেন না ছবির বইতে, গল্পে, এরকম অনেক অচেনা শব্দের অর্থ করতে তারা শিখেছে, এমনকি ছবির বই, গল্পের কল্যাণে "উট" শব্দ তাদের পরিচিতও বটে। "উ-ৎ-স-ব" "উৎসব" প্রথম পাতার আর একটি শব্দ যা নিম্নবিত্ত ঘরের শিশুর কাছে অপরিচিত।

এইভাবে যত পড়া এগোতে থাকে, খেটে খাওয়া ঘরের ছেলেমেয়ের কাছে বাংলা শেখা একটি বিদেশী ভাষা শেখার সামিল হয়ে ওঠে, কেন না যা সে শিখছে তা তার মাতৃভাষা, অর্থাৎ তার ঘরের এবং আশপাশের লোকের মুখের

ভাষা নয়, তাকে শিখতে হচ্ছে অপর শ্রেণীর ভাষা, কিছু মাত্রায় তরলীকৃত অবস্থায়। অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সবই তার কাছে বিদেশের বিবরণ। কিছুটা ভাষারই জন্য, বাকিটা বিষয়বস্তু ও তার ক্রমের জন্য।

শিক্ষায় বিষয়বস্তু চয়ন যে শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়, তারই নির্দশন দেখা গেল। কিন্তু এহ বাহ্য। শিক্ষার বিষয়বস্তুর গোটাটাই যুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে। সমাজ যাদের পরিচালনাধীন, তাদের ঘরের ছেলেমেয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য চালু সমাজের একজন পরিচালকের পদ অধিকারে সামর্থ্য অর্জন। বিষয়বস্তু চয়ন ও গ্রন্থনাও সেইমতোই হয়। সমাজে যে শোষিত, নিপীড়িত, এই বিষয়বস্তু দিয়ে তার ঘরের ছেলেমেয়ের কী লাভ হবে ?

নিপীড়কের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নিপীড়িত বিশেষ কিছু শিখবে না। যেটুকু শিখবে তার অন্তর্বস্তু হবে নিপীড়কের ব্যর্থ ও বিকৃত অনুকরণের এক জারজ লুম্পেন সংস্কৃতি। নিপীড়িত বোবাই হয়ে থাকবে, যখন সে মুখ খুলবে, তখনও নিপীড়কের কথাগুলিই সে বলে যাবে।

নিপীড়িতের ছেলেমেয়েকে তো এই সমাজকে কেমন করে নিজেদের অনুকূলে পাল্টানো যায়, সেই শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে। সে কেমন করে হবে ?

বারবিয়ানার ছেলেরা এই বিশ্লেষণ পর্যন্ত যায়নি। ব্রতধারী শিক্ষক প্রাণ ঢেলে কী শেখাবেন, কোন্ উদ্দেশ্যে শেখাবেন, শিক্ষা তাদের তৈরি করবে কোন্ ভূমিকার জন্য ? "এলিট" পুনরুৎপাদনের চক্রে ঢুকে নিপীড়িত দু' একজনের লাভ হতে পারে ব্যক্তিস্বার্থের বিচারে। শ্রেণীগতভাবে কী লাভ হতে পারে, কতটাই বা লাভ হতে পারে ? এইসব উত্তরের খোঁজ বারবিয়ানায় হয়নি।

চালু শিক্ষাব্যবস্থার বিপক্ষে বারবিয়ানার বিদ্রোহ এই অর্থে অসম্পূর্ণ। পূর্ণতা দিতে গেলে নিপীড়কের শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে নিপীড়িতের শিক্ষার বিকল্প সৃষ্টি করতে হবে। এই বিকল্প রূপ নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকায় চলেছে পাওলো ফ্রেয়ারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সূত্রবদ্ধ হয়েছে নিপীড়িতের নিজস্ব শিক্ষার প্রয়োজন ও কার্যক্রমের খসড়া।

* * * *

পাওলো দেখলেন, নিপীড়িতের কর্মের মালিক নিপীড়ক, তাই নিপীড়িতকে স্বাধীন ক্রিয়াশীল মানুষ বলে গণ্য করা হচ্ছে না। সে যেন নিপীড়কের উচ্ছিষ্ট একটি বস্তু, যেন একটা খালি বস্তা, যার মধ্যে খুশিমতো কিছু ধারণা ভরে দেওয়া যায়। নিপীড়কের শিক্ষা প্রণালীতে তাই শিক্ষক

কেবল বলে যান। ছাত্রের কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকে না।

নিরক্ষর বা সদ্য সাক্ষরদের জন্য পাঠ্যবইগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিপীড়কের সুবিধা অনুযায়ী এক নীতিমালা ধরে গ্রন্থনা চলে: ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে মর্যাদা দান, কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা রক্ষা, অহিংসা, গুরুজনে শ্রদ্ধা, জাতীয় কেন্দ্রের ছত্রছায়ায় সংহতি, পরিবার পরিকল্পনা।

৯—১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল কাঠামোর বাইরে নন-ফর্মাল ভাষা শিক্ষার সরকারি বই "লেখা-পড়া"। পাতায় পাতায় উপদেশ। পরিষ্কার থাকো, ময়লা থেকে রোগ হয়। ভিটামিন খাও, শাকসব্জিতে ভিটামিন আছে। আমরা সবাই মিলে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, মনে রেখো। "কিশলয়" বইতে শাক-তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া, বাস ধরে কারখানায় যাওয়ার আটপৌরে ব্যাপার নিয়ে পাঠ রচনার প্রচেষ্টায় অভিনবত্ব আছে। কিন্তু পিঠ চাপড়ানোর মনোভাব যাবে কোথায়? অষ্টম পাঠেই পাই, "মৃদুলের বাবা মৃগেনবাবু খুব ভাল লোক। তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন। কাউকে তিনি ঘৃণা করেন না। কৃষক-মজুর সবাইকে ভালবাসেন।" পাশের ছবিতে পাঞ্জাবি ও পাজামা পরা একটি ছেলে। চোখে চশমা। কাঁধে সাইড ব্যাগ, তাতে কাগজ উঁকি মারছে। দুটি "কৃষক-মজুর"-এর দিকে চেয়ে সে হাসছে। হাত রেখেছে একজনের কাঁধে। "কৃষক-মজুর"-দের একজনের হাতে কাস্তে, আর একজনের মাথায় পাগড়ি। নির্বাচনী প্রতীকটিই যেন খালি ছাপা হয়নি!

নিপীড়কের শিক্ষা যখন সচেতনভাবেই নিপীড়িতের দিকে নিক্ষিপ্ত, তখন তার উদ্দেশ্য নিপীড়িতকে "গড়ে তোলা", বশংবদ অনুগামী বানানো। এই শিক্ষায় যেগুলির জায়গা নেই তা হল স্বাধীন চিন্তা, নিজের সত্তা ও পরিবেশের বিশ্লেষণ, নতুন নতুন দিক ধরে সমালোচনা, অপরের বক্তব্য দ্রুত আয়ত্ত করার অভ্যাস, নিজের চিন্তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সামর্থ্য। বরং এই ধরনের কোনো লক্ষণের উন্মেষকে ভাবা হয় বিদ্রোহের প্রকাশ, শিক্ষায় অন্তর্ঘাত। এই অন্তর্ঘাতী শিক্ষাই পাওলোর হাতে রূপান্তরিত নিপীড়িতের শিক্ষার তাত্ত্বিক বুনিয়াদে।

নিপীড়িতের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবেক-সংস্থান (conscientization) —যে বিবেক নিপীড়িতকে শেখায় সে নিজেই তার কর্মের কর্তা, অপর কারো কর্মের উদ্দিষ্ট মাত্র সে নয়। ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলাকে নতুন করে সে আবিষ্কার করে তার নিজস্ব চিন্তা ও ক্রিয়ার বাহন ও হাতিয়ার হিসাবে। এগুলি আর তখন তাকে অবদমিত রাখার জন্য নিপীড়কের

হাতিয়ারের কাজ করতে পারে না।

কী পদ্ধতিতে ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলাকে বিবেক-সংস্থানের শিক্ষার অঙ্গ করে তোলা যায়? কেমন করে নিপীড়িত মানুষ শিক্ষাকে মুক্তির হাতিয়ার করে তুলতে পারে? পাওলো ও তাঁর অনুগামীদের অনুশীলন এই প্রশ্নগুলি ধরে ধরে তৈরি করেছে নিপীড়িতের শিক্ষাতত্ত্ব। এই অনুশীলনের প্রাথমিক একটা হদিস পাওয়া যাবে পাওলোর "পেডাগগি অব্ দি অপ্রেস্ড্" ও "কালচারাল এ্যাকশান ফর ফ্রীডম" বই দুটিতে।

পাওলোর শিক্ষাতত্ত্বের বিষয়বস্তু সবসময়ই মানুষঃ পরিবেশের মধ্যে মানুষ, প্রকৃতির সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ে মানুষ, সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে মানুষ, প্রকৃতি, সমাজ ও নিজের সদা পরিবর্তনের কর্তা মানুষ। শিক্ষা প্রণালীর বৈশিষ্ট্য, একজনের ক্রমাগত বলে চলার বদলে অনেকে মিলে আলোচনা, পূর্বনির্ধারিত এক বিশেষ লৌহ কাঠামোয় বেঁধে তত্ত্ব ও তথ্য ঘোষণার বদলে জীবনের বিশেষ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতকে সাংকেতিক ছাঁদে উপস্থাপন করে, যৌথভাবে সংকেত ভেদ করার অনুসন্ধান ক্রিয়ার মারফৎ অর্থ আবিষ্কার, নিজেদের আবিষ্কৃত এই ধারণাগুলির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ, আর সেই দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিত্তিতে পরিবেশ, প্রকৃতি, সমাজ ও নিজেদের পরিবর্তনের ক্ষমতা অর্জন।

বারবিয়ানার ছেলেরা যে বিষকে চিনেছে, তার লক্ষণ ব্যবচ্ছেদ করে অমৃত মন্থনের মন্ত্র এই নিপীড়িতের শিক্ষা। এই শিক্ষা যথার্থ হলে মানুষকে তা সচল করে তুলবে। তাই এই শিক্ষার সঙ্গে পরিবর্তন সাধনের বাস্তব কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাওলো যে গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার অভিযান চালিয়ে গেছেন, তারপর সেখানে কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছে, যদিও তিনি প্রচলিত কোনো অর্থে রাজনৈতিক প্রচার বা সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করেননি। আবার দূরের দেশ থেকে পরিবর্তনের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ কৃষক সংগঠন তাঁকে সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করতে ডেকে পাঠিয়েছে।

বারবিয়ানার ছেলেরা শিক্ষককে শিক্ষাদানে বিশ্বস্ত হতে ডাকছে। এই বিশ্বস্ততা থেকে শুরু শিক্ষকের নিজের পরিবর্তন। বিশ্বস্ততা তাঁকে বাধ্য করবে সত্যান্বেষণে। কেন শিক্ষা? এই প্রশ্ন যেই শিক্ষকের মনে জাগবে, তখনই তাঁর সামনে আসবে বাছাইয়ের সম্ভাবনা — "এলিট" পুনরুৎপাদনে দিনগত পাপক্ষয়, না নিপীড়িতের বিবেক-সংস্থানের ব্রতধারণ? বারবিয়ানার

ছেলেদের বইটি বিশ্বজুড়ে শিক্ষকদের বিবেক-সংস্থানের জ্ঞানাঞ্জন শলাকার কাজ করছে।

কলকাতার প্রান্তিক মানুষদের বসতিতে শিক্ষাকেন্দ্র গড়তে এই বই যাঁদের উৎসাহিত করেছে, অনুবাদক তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু এই প্রয়াস এখনও সীমাবদ্ধ মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে। আশা করা যায়, এই অনুবাদ আরো অনেককে নিপীড়িতের শিক্ষা নিয়ে ভাবতে ও হাতে-কলমে কাজ শুরু করতে অনুপ্রাণিত করবে। নৈঃশব্দের সংস্কৃতি ভাঙছে। বাংলা ভাষায় তার আওয়াজ এসে পৌঁছাল।

দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

"অনুবাদ অসম্ভব ভালো লেগেছে ... শিক্ষাব্যবস্থার ওপর লেখা এই বইটি পড়ে চিন্তার খোরাক পেয়েছি"

—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮৮

"এরকম লেখা আগে যে খুব পড়েছি বলতে পারি না।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮

"একটি অসামান্য গ্রন্থ, যা বয়স্ক, অভিজ্ঞ, আত্মতৃপ্ত শিক্ষককুলের মর্মমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলতে সক্ষম।"

—আরতি সেন, জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৯৫

"সুদূর ইতালীতে লেখা হলেও সমস্যাগুলির মিল আছে আমাদের দেশীয় পরিস্থিতির সঙ্গে। যে কোনো সচেতন মানুষকেই এই বই ভাবাবে..."

—মানব মন, সংখ্যা ৪, ১৯৮৯